কুহেলিকা
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

কুহেলিকা-৭৫

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

কুহেলি পর্বত? তুমি আমাকে কুহেলি পর্বতে নিয়ে এসেছো? দস্যুরাণী তীব্রকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

বনহুর জামার বোতামগুলো খুলতে খুলতে বললো— হাঁ, কুহেলি পর্বতেই আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কি উদ্দেশ্য তোমার?

তার জবাব এ মুহূর্তে পাবে না রাণীজী। এখন বিশ্রাম করো, আমি আসছি।

বেরিয়ে যায় বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা পাথরখণ্ড এসে গুহামুখ বন্ধ হয়ে যায়।

দস্যুরাণী শত চেষ্টা করেও পাথরখণ্ডটিকে একচুল নাড়াতে পারলো না। বাইরে শোনা গেলো ভারী বুটের শব্দ। বনহুর পর্বতের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

দস্যুরাণী লক্ষ্য করলো গুহার ওদিকে ছোট্ট একটি ছিদ্রপথ রয়েছে, সেই ছিদ্রপথে গুহার মধ্যে আলোর ছটা প্রবেশ করছে।

দস্যুরাণী ছুটে গেলো সেই ছিদ্রপথের পাশে। ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই নজরে পড়লো বনহুরের পিছন দিকটা। পর্বতের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে সে। বুটের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

যতক্ষণ বনহুরকে দেখা গেলো তাকিয়ে রইলো। রাগে-দুঃখে অপমানে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে তার। এমনভাবে সে বন্দী হবে, কোনো সময় ভাবতে পারেনি।

বিষণ্ন মনে ফিরে আসে দস্যুরাণী গুহার মেঝেতে। বসে পড়ে সে মেঝের মাটিতে, বড় অস্থির লাগছে ওকে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকার

মেয়ে নয় সে। কত কাজ তার পড়ে রয়েছে—রায়হান আস্তানায় তার জন্য অপেক্ষা করছে রঘুনাথ, সে ফিরে গেলে কোহেন পর্বতে যাবে সে। কোহেন পর্বতের পাদমূলে একটি গুহা আছে যে গুহায় তারা রেখে এসেছে তাদের রক্তে আঁকা ম্যাপের সন্ধানে উদ্ধার করা বহুমূল্য রত্নসম্ভার। সে আজ অনেক দিনের কথা। যদি রঘু সে গুহার সন্ধান না পায় তবে যেতে হবে তাকেই। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে অতি মূল্যবান। কিন্তু দস্যু বনহুর তার সব বাসনা লুপ্ত করে দিতে চলেছে, সব কাজ বরবাদ নস্যাৎ করে দিতে চলেছে সে। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে আসে দস্যুরাণীর, দস্যু বনহুরকে সে যতই কঠিন কথা শোনাক তার কাছে পরাজিত হয়েছে, কারণ বনহুর তার পাতালপুরীর লৌহকারাকক্ষ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। শুধু পালিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি, তাকেও কৌশলে হরণ করে এনে বন্দী করেছে।

কিন্তু কি করে দস্যু বনহুর সেই পাতালপুরীর লৌহকারাগার থেকে মুক্তি পেলো? তবে কি তার কোনো অনুচর ওকে মুক্ত করে দিয়েছে? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তারা জানে, তাদের রাণীজী কত ভয়ঙ্কর....দস্যুরাণী গুহার মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায়। পায়চারী করে চলে সে।

পাথুরিয়া মেঝেতে রাণীর বুটের আওয়াজ হতে থাকে। কেমন যেন প্রতিধ্বনি হচ্ছে বুটের আওয়াজের। নিস্তব্ধ গুহা—এক দস্যু রাণী-জমাট অন্ধকারের মধ্যে ছিদ্রপথের কিঞ্চিৎ আলোকরশ্মি।

দস্যুরাণীর মনে এলোমেলো চিন্তার উদয় হচ্ছে..... না না, অনুচরগণ তাকে মুক্তি দিতে পারে না। বনহুর অতি বুদ্ধিমান, সে নিজেই কৌশলে লৌহকারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছে। বনহুরের অনেক কথা সে শুনেছিলো, শুনেছিলো তার মত দস্যু নাকি পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন নেই। যাকে হাঙ্গেরী কারাগার আটকে রাখতে পারেনি। দস্যুরাণীর মনে তখন থেকেই একটা বাসনা উঁকি দিয়েছিলো, দস্যু বনহুরকে বন্দী করবেই সে। তারপর হীরাবাঈয়ের মুখেও যখন জানতে পারলো দস্যু বনহুর তাকে ফাঁকি দিয়েছে, তার ভালবাসা প্রেমকে অবহেলা করেছে, তখন একটা প্রতিহিংসার আগুন

জ্বলে উঠেছিলো রাণীর মনে। বনহুরকে বন্দী করতে পেরে তার মনে নতুন একটা স্বস্তির আনন্দ এসেছিলো, নিজেকে সে মনে মনে বারবার অভিনন্দন জানিয়েছিলো রাজ্য জয়ের অনুভূতির স্পন্দন নিয়ে।

কিন্তু এমনটি হবে ভাবতে পারেনি দস্যুরাণী। যা তার কল্পনার বাইরে তাই যেন ঘটে গেছে বা ঘটে গেলো নিজের অজান্তে।

দস্যুরাণীর দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে, সে যেন নিজকে কিছুতেই বন্দিনী বলে স্বীকার করে নিতে পারছে না। একটা অপমানের জ্বালায় শরীরটা যেন জ্বালা করছে তার।

মনের অস্থিরতা তাকে বেশি উন্মাদ করে তোলে। দস্যু বনহুর তাকে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এনেছে কে জানে। যদি তার সঙ্গে সে অন্যায় আচরণ করে, যদি তাকে নির্যাতন করে তাহলে কি রবে সে? যত শক্তিশালিনী; যত কঠিনই হোক না কেন, ও নারী সে পুরুষ—একা সম্পূর্ণ একা সে, যদি একটি অস্ত্রও তার নিকটে থাকতো তবু সে দস্যু বনহুরকে শায়েস্তা করে নিতো কিন্তু অস্ত্র তার কাছে নেই, অস্ত্র পড়ে গেছে কোথায় কে জানে।

দস্যুরাণী চঞ্চলভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করে, তারপর একসময় গুহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে। ক্লান্তি আর অবসাদে এলিয়ে আসে ওর দেহটা। ভাবতে থাকে না জানি এর শেষ কোথায়। আজ এই মুহূর্তে বারবার মনে পড়ে মিঃ আহাদের কথা—তিনি যদি জানতেন রাণী বিপদে পড়েছে তবে নিশ্চয় চুপ থাকতে পারতেন না, কিন্তু তিনি এখন ঝিন্দ থেকে ঝাম শহরের কোনো স্থানে অবস্থান করছেন। রহমত রঘু মদন ইউসুফ মংলু এরা কি করছে কে জানে! যদিও কেউ মিঃ চৌধুরীকে সংবাদ জানায় কিন্তু কিই বা লাভ হবে। হয়তো কান্দাই শহরে গিয়ে তিনি তার অনুসন্ধান চালাবেন। অথচ তাকে কুহেলি পর্বতের কোনো এক শৃঙ্গের গোপন গুহায় আটক রাখা হয়েছে।

দস্যুরাণী এলোপাতাড়ি চিন্তার মধ্যে তলিয়ে যায়। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানতে পারেনি সে।

কুহেলি পর্বত মন্থনা দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় হাজার মাইল দূরে। মন্থনার চারপাশে ঘিরে রয়েছে গভীর নীল অথৈ জলরাশি? নাম তার নীলনদ বা নীল সাগর। শুধু উত্তর-পশ্চিম দিকে নীল সাগর যেন এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাধার প্রাচীর পাথুরিয়া ভূমিখণ্ড, যে ভূমিখণ্ড মন্থনা দ্বীপ এবং মন্থনা দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমের মাঝে একটি খাদের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

সিবিয়ার সর্দার আলমা বনহুরকে সেই পথে মন্থনা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলো। সর্দার আলমার অজানা ছিলো না যে অশ্বপদ শব্দ তাকে চঞ্চল উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো সে অশ্ব কার এবং কেন সে এই পথে দ্রুত এগুচ্ছে।

বনহুর যখন মন্থনায় প্রথম পদার্পণ করেছিলো তখন পরিচয় ঘটেছিলো সর্দার আলমার সঙ্গে। আলমা বনহুরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো। শুধু মুগ্ধ নয় অভিভূত হয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করেছিলো তার পরিচয়।

বনহুর বৃদ্ধ আলমার কাছে আত্মগোপন করা শ্রেয় মনে করেনি, সে নির্ভীক চিত্তে নিজের পরিচয় জানিয়েছিলো তাকে।

ওর পরিচয় জানতে পেরে সেদিন বৃদ্ধ আলমার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে উঠেছিলো। ওর দক্ষিণ হাতখানা হাতে ধরে বসিয়ে নিয়েছিলো নিজের পাশে দড়ির খাটিয়াখানায়। পিঠ চাপড়ে বলেছিলো সেদিন, সাবাস।

বনহুরের চোখ দুটো বিস্ময়ে স্থির হয়ে গিয়েছিলো, কারণ আলমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন ওর কত পরিচিত কিংবা আপন জন।

আলমা বনহুরকে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছুমাত্র আশ্চর্য হয়নি। বুঝতে পেরেছিলো বনহুরের মনোভাব, তাই সে একটু হেসে বলেছিলো— তোমাকে দেখিনি কোনোদিন কিন্তু তোমার নাম আমি শুনেছিলাম। তোমার নামের সঙ্গে তোমার চেহারায় হুবহু মিল আছে। সাবাস বেটা সাবাস! হাঁ, মনে রাখবে তোমার ললাটে আছে জয়টিকা। কেউ তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না, তবে একদিন তুমি পরাজিত হবে এবং সে পরাজয় হবে তোমার অতি আপন.....

থেমে গিয়েছেলো সেদিন আলমা।

বনহুর জিজ্ঞাসা করেনি, কারণ আলমার কথায় সে গুরুত্ব দেয়নি তেমন করে। বেশিক্ষণ বসবার সময়ও সেদিন হয়নি তার। বলেছিলো আলমাকে সে—বিদায় আলমা।

হাত তুলে বলেছিলো আলমা—যখনই এ পথ দিয়ে আসবে তখন আমাকে খেয়াল করো, যাত্রা শুভ হবে তোমার।

বনহুর বিদায় নিয়েছিলো সেদিন।

কিন্তু যেদিন সে পুনরায় মন্থনা দ্বীপে পদার্পণ করেছিলো ঐ দিন সাক্ষাৎ করেছিলো সে আলমার সঙ্গে। আলমা বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা তুলে ধরেছিলো নিজের চোখের সম্মুখে, একটা স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠেছিলো বৃদ্ধের মুখে, বলেছিলো সে—যাও বৎস, যাত্রা শুভ হবে।

বনহুর অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলো সেদিন আলমার কাছ থেকে। এবার হবে বৃদ্ধের কথার সত্যতার প্রমাণ। যাত্রা শুভ হবে, কথাটা তার কানে প্রতিধ্বনি তুলেছিলো। কিন্তু দস্যুরাণী দরবারকক্ষে গিয়ে যখন সে বন্দী হয়েছিলো তখন আলমার কথাগুলো স্মরণ করে মনে মনে হেসেছিলো বনহুর।

অবশ্য বন্দী হবার তিনদিন পর যখন সে পুনরায় অতি সহজে সেই দুর্গম কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো তখন পুনরায় আলমার কথা স্মরণ হয়েছিলো। একটা বিশ্বাস এসেছিলো ওর কথার উপর। তারপর যা সে ভেবেছিলো, যে উদ্দেশ্যে সে দস্যুরাণীর আস্তানায় এসেছিলো, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার।

এমনকি আলমা তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছে। আলমা যেন ঠিক ঠিকই জানতো বনহুর তার অশ্ব নিয়ে আবার ফিরে আসবে এবং সে যেন ঐ কারণেই দাঁড়িয়েছিলো পথের বুকে।

বনহুরের অশ্বপদশব্দটাও আলমার পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। বনহুর যখন আলমার সঙ্গে দেখা করেছিলো প্রথমবার তখন আলমা তাকে অশ্ব নিয়ে মন্থনায় আসার জন্য বলেছিলো।

বনহুর উপেক্ষা করেনি আলমার কথা, কারণ আলমা তাকে বলে দিয়েছিলো, কান্দাই জঙ্গল থেকে কোন্ পথে এলে তার সহজ হবে এবং সে নির্বিঘ্নে মন্থনায় পৌঁছতে পারবে।

অশ্ব নিয়েই এসেছিলো বনহুর দ্বিতীয়বার এবং যে পথে আসার জন্য আলমা তাকে বলেছিলো ঐ পথেই এসেছিলো আলমার কাছে যদিও মৃত্যুগহ্বর দুর্গম খাদ অতিক্রম করে তাকে আসতে হয়েছিলো মন্থনায়। বনহুরের যেমন অসাধ্য ছিলো না কিছু, তেমনি তাজের অসাধ্যও ছিলো না কিছু। ঐ দুর্গম খাদ অতিক্রম করতেও তাজ অক্ষম হয়নি। দক্ষ তাজ হৃষ্টচিত্তে এপারে এসেছিলো, এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি—যেমন বনহুর তেমনি তাজ।

আলমার মুখ খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠেছিলো, সে বুঝতে পেরেছিলো বনহুর অদ্ভুত এক মানুষ যার কোনো জুটি নেই। ঐ মুহূর্তে আলমা তাকে বুকে জড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করেছিলো কিন্তু নিজকে সে সামনে নিয়েছিলো অতি সংযতভাবে, কারণ তার সঙ্গী-সাথীরা সর্দারকে বেশি উচ্ছল হতে দেখতে মনে কিছু করতে পারে। অবশ্য আলমা কারও মনে করাকে তেমন আমল দেয় না।

বনহুরও কম আনন্দলাভ করেনি, আলমার সহায়তা তাকে অনেকখানি উৎসাহী করে তুলেছে মন্থনার কাজে। দস্যুরাণীর পাতাল গহ্বরের লৌহকারাগারে যখন আবদ্ধ ছিলো বনহুর তখনও মনের বল হারায়নি একটুও কারণ তাকে আটক রাখা সাধ্য নয় কারোর, নিজেই তা অনুভব করে সমস্ত অন্তর দিয়ে। যখন বন্দী ছিলো তখন সে মনে মনে ভাবছিলো মুক্তির উপায়।

এমন দিনে শুরু হলো রাণীজীর আদেশে তার আস্তানায় আনন্দোৎসব। বনহুরকে গ্রেফতার করার সাফল্য এ আনন্দোৎসবের কারণ, তাও জানতে পারলো। তখন একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো তার মুখে।

লৌহ কারাকক্ষের মধ্য থেকে বেরোতে বেশি বেগ পেতে হয়নি বনহুরকে। যখন সবাই আনন্দে আত্মহারা তখন বনহুর একটি লোহার রড

সংগ্রহ করে নিয়েছিলো এবং সেই রডের দ্বারা কারাগারের তালা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো সে। অবশ্য কষ্ট হয়েছিলো, কারণ তালা ছিলো একটা নয়; বেশ কয়েকটা এবং সেগুলো ছিলো অত্যন্ত মজবুত।

বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসে বনহুর নেশাযুক্ত প্রহরীদের সবাইকে পিছমোড়া করে বেঁধে গোপন একস্থানে আটক রেখেছিলো যাতে তাদেরকে কেউ খুঁজে না পায়। তারপর সে দুর্গম সুড়ঙ্গ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো দস্যুরাণীর দরবারকক্ষ অভিমুখে।

সমস্ত আস্তানা জুড়ে তখন চলেছিলো আনন্দোৎসব। তাই কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি বা লক্ষ্য করার মত কারও সুযোগ হয়নি। বনহুর ভাবতে পারেনি এত সহজ হবে কাজটা।

সে দরবারকক্ষে প্রবেশের পরই মশাল লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলো একটি নয়; পরপর কয়েকটি—যে গুলীর কোনো শব্দ ছিলো না এবং মশালের আগুন নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। এ ছাড়া যে আলো ছিলো সে আলোও কৌশলে নিভিয়ে দিয়েছিলো বনহুর। কাজেই সমস্ত আস্তানা নিকষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো।

বনহুর অতি সহজেই দস্যুরাণীকে দরবারকক্ষ থেকে তুলে নিতে পেরেছিলো এবং আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো অবশ্য আলমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে সে সফলকাম হয়েছিলো এবং সেই কারণেই বনহুর দস্যুরাণীকে কুহেলী পর্বতের গোপন একটি গুহায় আটক রেখে পুনরায় ফিরে এসেছিলো আলমার কাছে।

খাদ পেরিয়ে এপারে এসে আলমার বাড়ির দরজায় অশ্ব থামিয়ে নেমে পড়লো বনহুর। কিন্তু আলমা কই? অশ্বপদশব্দ শোনা-মাত্র কুটির থেকে বেরিয়ে আসতো সে এবং উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো পথের পাশে। বনহুরের অশ্বখুরের শব্দ সে চিনতো।

বনহুর কুটিরের সম্মুখে থেমে দাঁড়াতেই কয়েকজন সিবিয়াবাসী আলমার সহচর বেরিয়ে এলো। তারা বনহুরকে দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সম্মুখে একটি জায়গা।

বনহুর তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো সে, কারণ দেখতে পেলো একটি সদ্য তৈরি কবর। চমকে ফিরে তাকিয়ে বললো বনহুর—এ কবর কার?

নতুন কবরটার চারপাশে ছোট ছোট কাঠের খণ্ড দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে, যেন কোনো হিংস্র জীবজন্তু কবর খনন করে মৃতদেহ ভক্ষণ করতে না পারে।

বনহুরের প্রশ্নের জবাবে একজন সিবিয়াবাসী জবাব দিলো—তুমি জানো এ কবর কার?

বনহুর বললো—না তো?

লোকটা বললো—সর্দার আলমার।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর—আলমা মারা গেছে! যে একটু আগেই আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছিলো?

হাঁ, তিনি নিহত হয়েছেন? বললো লোকটা।

নিহত! কে তাকে নিহত করেছিলো? উত্তেজিত বিস্মিত কণ্ঠে বললো বনহুর। ওর হাতের মুঠায় তাজের লাগাম ধরা রয়েছে।

লোকটা বললো—দস্যুরাণীর প্রধান অনুচর তাকে হত্যা করেছে।

বনহুর যেন নীরব হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। চোখ দুটো তার কেমন যেন ছলছল হয়ে উঠলো। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটের কিছু অংশ কামড়ে ধরে নিজকে সামলে নিলো। তারপর বললো বনহুর—দস্যুরাণীর প্রধান অনুচর আলমাকে হত্যা করেছে, একথা সত্য?

বললো লোকটা—হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।

বনহুর কিছুক্ষণ নীরব রইলো, তারপর বললো—আমি চললাম। কথা দিচ্ছি আলমা হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে চেপে বসলো তাজের পিঠে।

আলমার দলবল দাঁড়িয়ে রইলো নির্বিকার চিত্তে।

তাজের পিঠে বনহুর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

❑

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট কামরায় মিঃ আহাদ বসে ছিলেন। তাঁরই কামরায় পাশের ক্যাবিনে কোনো এক ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে রয়েছে রহমত। রহমত এবং মিঃ আহাদ দস্যুরাণীর সন্ধানেই চলেছে কান্দাই শহরে।

মিঃ আহাদ জানেন দস্যু বনহুরের প্রধান আস্তানা কান্দাই জঙ্গলের কোনো এক স্থানে। সেই কারণেই তিনি কান্দাই যাচ্ছেন, যেমন করে হোক রাণীকে খুঁজে বের করতেই হবে, উদ্ধার করতে হবে তাকে।

দুশ্চিন্তায় মিঃ আহাদ একেবারে মুষড়ে না পড়লেও তাঁর মুখোভাব বিষণ্ন ম্লান—সদা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। মাঝে মাঝে রহমত এসে বসে, তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়।

কিন্তু মনের গভীর দুশ্চিন্তার লাঘব হয় না। দস্যুরাণীকে তিনি ভালবাসেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। শুধু ভালবাসাই নয়, ওকে মিঃ আহাদ কথা দিয়েছেন, রাণী, তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী হবে, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করবো না.....রাণী, তুমি কি তাতে খুশি হবে? বলেছিলো রাণী, ওগো তুমি যে আমার জীবনসর্বস্ব। তোমাকে পেলে আমি ধন্য হবো....রাণী বুকে মাথা রেখেছিলো তাঁর!

আজ বারবার সেই কথাগুলো মিঃ আহাদের মনে স্মরণ হতে থাকে। দস্যু বনহুর রাণীকে ধরে নিয়ে গেছে, যদি সে তাকে বন্দী করে রাখে তাতে ক্ষতি নেই। যদি তার উপর কোনো নির্যাতন চালায় সে, তাহলে কি হবে? যদি তার নারীত্বের অবমাননা করে সে.... না না, তা হয় না, তা হয়না, রাণীর সতীত্বের উপর কেউ পাশবিক অত্যাচারে সক্ষম হবে না এ বিশ্বাস তার আছে..... কিন্তু যদি সেই বিশ্বাস বিনষ্ট হয়.... মিঃ আহাদের সুন্দর

মুখমণ্ডল ভীষণভাবে কঠিন হয়ে উঠে। একটা অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠে তাঁর মুখে। মিঃ আহাদ পায়চারী করতে থাকেন।

এমন সময় রহমত এসে দাঁড়ায় দরজার পাশে। মিঃ আহাদকে চিন্তিতভাবে পায়চারী করতে দেখে সে এগুতে সাহস করে না, ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিজের ক্যাবিনে।

এখানে নীল সাগরে যখন মিঃ আহাদ দস্যুরাণীর কথা নিয়ে ভাবছেন তখন কুহেলী পর্বতের একটি গুহায় দস্যুরাণীও ভাবছে মিঃ আহাদের কথা।

কখন কবে মুক্তি পাবে সে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কতদিন তাকে এই গুহায় কাটাতে হবে তাই বা কে জানে। মিঃ আহাদ তার সন্ধানে হয়তো চষে ফিরবে সমস্ত দেশ। রহমত নিশ্চয়ই তাকে সব কথা জানিয়েছে.....

এমন সময় কানে ভেসে আসে অশ্বপদশব্দ। দস্যুরাণী ছুটে যায় সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রটির পাশে। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে দেখতে পায় দস্যু বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে পর্বতের গা বেয়ে এগিয়ে আসছে। দস্যুরাণী ভীত আতঙ্কিত না হলেও মনে মনে কিছুটা ঘাবড়ে গেলো—কারণ সে একা এবং নারী, এই নির্জন গুহায় দস্যু বনহুর যদি তার উপর কোনোরকম..... না না, নিজকে রক্ষা করতেই হবে যেমন করেই হোক.....

এবার অশ্বপদশব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। দস্যুরাণী পুনরায় এসে দাঁড়ালো ছিদ্রপথের পাশে। তাকিয়ে দখলো, বনহুর উঠে আসছে। পর্বতের গা বেয়ে অশ্বযোগে নয় পায়ে হেঁটে। তার হাতে একটা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।

দস্যুরাণী গভীর একটা উদ্বিগ্নতা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে প্রায়, যদিও গুহার ভিতরে সময় নির্ণয় করা কঠিন ছিলো। দস্যুরাণী গুহার ছিদ্রপথে দৃষ্টি রেখে বেলা শেষ হয়ে এসেছে অনুমান করে নিয়েছে।

দরজার পাথর সরে গেলো।

দস্যুরাণী মেঝেতে বসেছিলো তেমনি রইলো। মনের উদ্বিগ্নতা যেন মুখোভাবে প্রকাশ না পায়, সে কারণে মাথা নিচু করে রইলো সে।

বনহুর গুহামুখে প্রবেশ করে বললো—নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ অবস্থায় অস্বস্তি বোধ করছিলে দস্যুরাণী?

বনহুরের মুখে এই প্রথম সে দস্যুরাণী সম্বোধনটা শুনতে পেলো। চোখ তুলে ফিরে তাকালো সে বনহুরের দিকে।

বনহুর মেঝের মাঝখানে এসে হাতের পুঁটলিটা ছুড়ে দিলো দস্যুরাণীর দিকে—নাও খেয়ে নাও, সমস্ত দিন না খেয়ে কাটালে।

দস্যুরাণী রাগে-ক্রোধে অধর দংশন করছিলো, সে বললো—নিয়ে যাও তোমার খাবার, আমি কিচ্ছু খাবো না।

একটু অবাক হবার ভান করে বললো বনহুর—খাবে না!

না।

কেন?

তুমি বলো কেন আমাকে এখানে এনেছো?

ও, এখনও বুঝতে পারোনি? যে কারণে তুমি আমায় বন্দী করেছিলে ঠিক সেই কারণে।

আমি তোমাকে বন্দী করেছিলাম আমার বান্ধবী হীরাবাঈকে খুশি করার জন্য, কিন্তু সে সুযোগ আমাকে তুমি দাওনি....

হাঁ, সে সুযোগ যাতে তোমার না আসে সেই কারণেই আমি তোমাকে হরণ করতে বাধ্য হয়েছি এবং তোমার ভুল ধারণার জন্য তোমার শাস্তি এই কুহেলি পর্বতে তোমার বন্দী অবস্থা......

না, আমাকে তুমি আটকে রাখতে পারবে না। আমাকে কেউ কোনোদিন বন্দী করতে সক্ষম হয়নি।

কিন্তু আমি তো হয়েছি। দস্যুরাণী, তুমি যত গর্বই করো, কুহেলি পর্বত থেকে তোমার মুক্তি নেই। নাও, কথা না বাড়িয়ে খেয়ে নাও। ঐ পুঁটলিতে ফলমুল আছে.....

নরপশু তুমি খাও। আমার খাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

নরপশু! হাঃ হাঃ হাঃ, নরপশুই বটে। তুমি যেমন নরঘাতিনী, আমি তেমনি নরপশু। তোমার অনুচরদের মত অহেঁতুক নরহত্যা আমি করি না।

জানো দস্যুরাণী, তোমার প্রধান অনুচর নির্দোষ নিরপরাধ সর্দার আলমাকে হত্যা করেছে?

দস্যুরাণী নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলো, কথাটা যেন সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো আলম্যাকে এবং কেন তাকে হত্যা করেছে তার প্রধান অনুচর রহমত। রাতের অন্ধকারে হলেও দস্যুরাণী ঐ মুহূর্তে লক্ষ্য করেছিলো, বৃদ্ধ আলমা দস্যু বনহুরকে পথের নির্দেশ দিয়েছিলো। বলে উঠে দস্যুরাণী—আমার অনুচর তাকে হত্যা না করলেও আমি তাকে হত্যা করতাম......

সে উপায় তোমার ছিলো না দস্যুরাণী! যাক ওসব কথা, এবার খেয়ে নাও। দুদিন সম্পূর্ণ উপবাসে আছো, সত্যি এজন্য আমি দুঃখিত।

আমি খাবো না।

এতে আমার ক্ষতির চেয়ে তোমার ক্ষতিসাধন হবে বেশি। তা ছাড়া দু চার দিনের কথা নয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। খেয়ে নাও, জীবনে তোমাকে বাঁচতে হবে।

না, আমি খাবো না।

খেতে হবে তোমাকে। বনহুর নিজের হাতে পুঁটলি খুলে বের করে কিছু আংগুর ফল। রাণীর সম্মুখে ধরে বলে—নাও? না—ও... ..... কঠিন কণ্ঠস্বর বনহুরের।

দস্যুরাণী চোখ তুলে তাকালো, সত্যি সে এবার বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছে। বনহুরের চোখে নিবদ্ধ ওর চোখ দুটো।

বনহুর বললো—খাও! তুলে ধরে বনহুর ওর মুখের কাছে।

দস্যুরাণীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো মিঃ আহাদের প্রতিচ্ছবি.... তিনি যেন হাতে বাড়িয়ে তার মুখের সম্মুখে তুলে ধরলেন ফলগুলো।

দস্যুরাণী অভিভূতের মত হাত বাড়িয়ে বনহুরের হাত থেকে ফলগুলো নিয়ে খেতে শুরু করে।

বনহুর খুশি হয়।

সে আরও ফল এগিয়ে ধরে।

দস্যুরাণী খেয়ে চলে।

বনহুর বলে—রাণীজী, আমি তোমাকে কোনোরকম অসম্মান করবো না, যদিও তুমি আমার প্রতি অন্যায় করেছিলে।

দস্যুরাণী তখনও নির্বাক হয়ে চিবুচ্ছিলো ফলমূলগুলো। বনহুরের কথায় সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, তাকালো ওর মুখের দিকে।

বনহুর বললো আবার—তুমি এখানে থাকবে আমার বন্দিনী হিসেবে, আমি চললাম।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর।

দস্যুরাণীর দুচোখে বিস্ময়। অদ্ভূত এ লোকটা, যার সঙ্গে তুলনা হয় না কারও। তাকে নিঃসঙ্গ একা পেয়ে ও কোনোরকম অন্যায় আচরণ সে করেনি বা করলো না। বরং তাকে খাবার জন্য ফলমূল এনে দিলো। আর সে নিজে কত না অন্যায় আচরণ করেছে—শুধু শুকনো রুটি তাকে খেতে দিয়েছে কারাগারের মধ্যে।

লজ্জায় দস্যুরাণীর চোখ দু'টো নত হয়ে আসে যেন, মাথা নিচু করে নেয় সে।

বনহুর বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরে বলে—সেজন্য লজ্জার কিছু নেই, কারণ আমি তোমাকে অনেক পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আচ্ছা আজ চলি, আবার দেখা হবে.... বনহুর উঠে দাঁড়ায় এবং বেরিয়ে যায় দ্রুত গুহা থেকে।

গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখে পাথরখণ্ডটি এসে পথরোধ করে দেয়।

দস্যুরাণী উঠে আসে গুহার দেয়ালে ছিদ্রটির পাশে। ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিফল হলো সে, কারণ তখন বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে।

ভারী বুটের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে।

দস্যুরাণী মেঝেতে বসে পড়ে স্থির হয়ে।

❑

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো দস্যুরাণী খেয়াল নেই তার। হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসায় ঘুম ভেঙ্গে যায়, ধড়মড় করে উঠে বসে দস্যুরাণী। গুহার বাইরে শব্দটা হচ্ছে বলে মনে হলো তার। তাকালো সে ঐ ছিদ্রপথের দিকে, একটা দীপ্ত আলোকচ্ছটা ঐ ছিদ্রপথে প্রবেশ করে গুহার মধ্যে।

দস্যুরাণী তার ভূতল শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। অনেক গুলো পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষের গলার আওয়াজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দস্যুরাণী দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো গুহামধ্যের সেই ছিদ্রপথের ধারে। দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বিস্মিত হলো সে। অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরা একদল লোক উঠে আসছে পর্বতের গা বেয়ে উপরের দিকে। প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সেই মশালের আলোর দীপ্ত ছটা প্রবেশ করছে সেই ছিদ্রপথে গুহার মধ্যে।

দস্যুরাণী শিউরে উঠলো। যদিও ভয় বলে তার মনে কিছু ছিলো না, কারণ সে নিজেই ভয়ঙ্কর। গভীর রাতে এরা কারা! এদের দেখে মনে হচ্ছে তারাই গুহা লক্ষ্য করে উঠে আসছে। তবে কি দস্যু বনহুর তাকে শায়েস্তা করার জন্য এদের পাঠিয়েছে কিংবা জেনেশুনে এদের গুহায় তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থির হয়ে ভাববার সময় নেই, একটা দারুণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। চঞ্চলভাবে গুহার এদিক থেকে সেদিক কয়েকবার ছুটোছুটি করলো সে! মৃত্যুকে ভয় করে না দস্যুরাণী, ভয় তার নিজের ইজ্জৎ—যা সে অতি বিপদেও বিনষ্ট করেনি বা বিনষ্ট হতে দেয়নি।

ওরা কারা?

দস্যুরাণী পুনরায় এসে ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। অনেক এগিয়ে এসেছে ওরা, একেবারে গুহার কাছাকাছি। কি ভয়ঙ্কর চেহারা এক একজনের। পরনে সেকি অদ্ভুত ভীষণ ধরণের পোশাক। প্রত্যেকের মুখে চুনকালির প্রলেপ। বাম হাতে মশাল এবং ডান হাতে সুতীক্ষ্ণধার অস্ত্র।

ওদের হাতের মশালের আলোতে ওদের দেহগুলোকে এক একটা যমদূতের মত মনে হচ্ছিলো।

ওরা আরও কাছে এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে ওরা উৎকট শব্দ করছিলো, হয়তো কোনো আনন্দসূচক শব্দ হবে। দস্যুরাণী ভালভাবে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠলো, সে দেখতে পেলো ওরা তিনজন লোককে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বয়ে নিয়ে আসছে। লোক তিনজন অসভ্য জংলী নয়, তারা স্বাভাবিক মানুষ।

দস্যুরাণীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। কারা ঐ বন্দীত্রয় যাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছে? মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেলেও ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে না কারা ওরা।

একেবারে গুহার সম্মুখে পৌঁছে গেছে তারা।

এ গুহাটা যে স্থানে সে স্থান ভূমি থেকে প্রায় মাইলখানেক উঁচুতে হবে। অনেক কষ্টে এতটা পথ উপরে উঠতে হয়, কারণ কুহেলি পর্বতের এ গুহাটা অন্যান্য শৃঙ্গের চেয়ে বেশ উঁচু। তবে কুহেলি পর্বতের সবচেয়ে বড় শৃঙ্গের নাম কুহেলিকা।

সত্যি ঐ শৃঙ্গটি কুহেলিকাই বটে।

কেউ কোনোদিন কুহোল পর্বতের কুহেলিকা শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হয়নি। পর্বত আরোহণকারীদেরও অসাধ্য ছিলো এই শৃঙ্গটি।

দস্যুরাণী যখন বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে লক্ষ্য করছে আর বুঝি তার রক্ষা নেই, ঐ বন্দীত্রয়ের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে যাবে এবং হত্যা করবে একসঙ্গে, ঠিক ঐ সময় দেখলো অদ্ভুত লোকগুলো তার গুহার পাশ কেটে পর্বতের সবচেয়ে বড় এবং উঁচু শৃঙ্গটির দিকে চলে যাচ্ছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো দস্যুরাণী। কিন্তু একি, ঠিক ছিদ্রপথের সম্মুখে আসতেই রাণী চিৎকার করে উঠলো—একি, মিঃ আহাদ চৌধুরী, রহমত.......

কিন্তু ততক্ষণে লোকগুলো তাদের নিয়ে সরে গেছে গুহার ছিদ্রপথের নিকট হতে। দস্যুরাণী শত চেষ্টা করেও আর দেখতে পেলো না তাদের।

দস্যুরাণীর বুকের ভিতর অসহ্য একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সত্যিই কি মিঃ আহাদ এবং রহমতকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে? সত্য নয় তো কি? তার চোখের দৃষ্টি তো আর মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু মিঃ আহাদ এবং রহমতকে ওরা পেলো কোথায়? নিশ্চয়ই ভুল দেখতে পেয়েছে সে। তবে কি তাদেরই মত অন্য কেউ হবে? না না, সে স্পষ্ট দেখেছে মশালের আলোতে মিঃ, আহাদ এবং রহমতকে। হয়তো মিঃ আহাদকে তার হরণ করা ব্যাপার সম্বন্ধে সব জানিয়েছিলো, তাই তিনিও এসেছিলেন তার খোঁজে। এসে এদের হাতে ধরা পড়ে গেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো দস্যুরাণী, নিজের চাইতে বেশি চিন্তিত হলো সে মিঃ আহাদ ও রহমতের জন্য—নিশ্চয় ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা হত্যা করবে কিংবা কোনো দুর্গম জায়গায় বন্দী করে রাখবে। যত ভাবছে ততই বুকের ভিতরে অসহ্য একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে সে। বারবার ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও আর কিছু নজরে পড়ছে না, ওরা চলে গেছে এই শৃঙ্গটার পিছনে। আলোকরশ্মিও আর নজরে পড়ছে না তার।

❑

দস্যুরাণী যা দেখেছে মিথ্যা নয়, স্বয়ং মিঃ আহাদ এবং রহমত ও আরও একজন ব্যক্তিকে ওরা পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে।

জাহাজখানা যখন ঝাম থেকে রওনা দিয়ে মন্থনা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে নীলনদ অতিক্রম করে এগুচ্ছিলো তখন হঠাৎ জলদস্যুদের কবলে পড়ে জাহাজখানা।

যখন জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিলো তখন রাত ছিলো গভীর। মিঃ আহাদ নিজের ক্যাবিনে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাশের ক্যাবিনে ছিলো রহমত এবং আর একজন লোক। লোকটি কান্দাইবাসী কোনো ব্যবসায়ী। রহমত ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো যখন জানতে পেরেছিলো লোকটা কান্দাইবাসী। ভেবেছিলো ওর সহায়তায় তারা কান্দাই শহরে নিজেদের কাজ

সহজ করে নিতে পারবে। সেই কারণেই ব্যবসায়ী ইউসুফ আলী সাহেবকে নিজ ক্যাবিনে রেখেছিলো সে।

ইউসুফ আলীও রহমতের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলো। অল্প সময়েই ওদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছিলো। উভয়ে উভয়কে বন্ধু মনে করে একই ক্যাবিনে থাকতো ওরা।

যে রাতে জলদস্যু দ্বারা জাহাজখানা আক্রান্ত হয়, ঐ রাতেও রহমতের ক্যাবিনে ঘুমিয়েছিলো ইউসুফ আলী।

হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো মিঃ আহাদের, তিনি চোখ মেলেই বিস্মিত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মিঃ আহাদ চৌধুরী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর শয্যার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো অদ্ভুত পোশাকধারী লোক, তাদের প্রত্যেকের হাতেই সুতীক্ষ্ণধার বর্শা। একজন হয়তো তাদের দলপতি হবে—তার হাতে পিস্তল। দলপতি পিস্তলটা মিঃ আহাদের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত করে রেখেছে।

মিঃ আহাদ এমন একটা অবস্থার জন্য ঐ মুহূর্তে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অনেক রাত অবধি জেগে ছিলেন। নানারকম দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলো তাঁর মন। তিনি শয্যায় শুয়ে শুয়ে শুধু সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছিলেন। তারপর একসময় ক্লান্তি নেমে এসেছিলো তাঁর চোখে। নিজের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি খেয়াল নেই।

মিঃ আহাদ বাধ্য হলেন শয্যা ত্যাগ করতে এবং জলদস্যুগণ ততক্ষণে তাকে বেঁধে ফেললো মজবুত করে। জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে বন্দী করা এত সহজ হতো না যত সহজ হলো তাকে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী করা।

যখন মিঃ আহাদকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় অপর একটি ছোট্ট জাহাজে উঠানো হলো তখন তিনি দেখতে পেলেন ইউসুফ আলী এবং রহমতকেও তারা শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় জাহাজে এনে বন্দী করে রেখেছে। তিনি একেবারে নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। বলবার এবং করবার কিছু ছিলো না। এমন যে একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, এ ধারণাও আপাততঃ ছিলো না তাঁদের। তাই তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতনও ছিলেন না এ ব্যাপারে।

আরও কিছুটা অবাক হয়েছিলেন মিঃ আহাদ, কারণ ঐ জাহাজে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শুধু তাদের তিনজনকেই ওরা বন্দী করে এনেছে। জাহাজের অন্য লোকজন গেলো কোথায় বা তাদেরকে কি করা হয়েছে কিছু বুঝতে পারলেন না তাঁরা।

এমন কঠিনভাবে তাঁদের হাত-পা মজবুত করে বাঁধা হয়েছিলো যার দরুন একচুলও নড়বার উপায় ছিলো না তাঁদের।

একটা ছোট্ট ক্যাবিনে তাঁদের তিনজনকে বন্দী করে রাখা হলো।

একটানা জাহাঝের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাঁদের কানে আসছিলো না। তাঁদের বন্দী করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন না তাঁরা।

রহমতকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ আহাদ—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাদের তাই না?

রহমত বললো—না, আমাদের চেয়ে আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে, কারণ আমরা এসবে অভ্যস্ত আছি। আপনি এসবে অভ্যস্ত নন, তাই...

বললেন মিঃ আহাদ—কে বললো আমি অভ্যস্ত নই? জানো রহমত, জীবনে বহুবার আমাকে এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

ইউসুফ আলী প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো—আমার শরীরের কষ্টের চেয়ে মনের কষ্ট অনেক বেশি হচ্ছে। আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না আমার মনে কি কষ্ট হচ্ছে। আমার যে মাল ছিলো তা আমার জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে কেনা। সব হারিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি...... ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ইউসুফ আলী।

মিঃ আহাদ বললেন—আলী সাহেব, আপনি অযথা মনকষ্টে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। মাল হারিয়েছেন, এখনও জীবন আছে। যদি জীবনটা রক্ষা পেতো তবু লাভ ছিলো। যদি জীবন না থাকে তবে মাল থাকলেও কোনো ফল হবে না। কাজেই আপনি দুঃখ করবেন না শুধু ভাবুন জীবন রক্ষার কোনো উপায় খুঁজে বের করা যায় কিনা।

মিঃ আহাদের কথাটা যে নির্ঘাৎ সত্য তাতে কোনো ভুল নেই, কারণ যদি জীবন রক্ষা না পায় তবে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ইউসুফ আলী বেশ ভাল করেই তা অনুভব করলেন কয়েক ঘন্টা পরে। যন্ত্রণায় হাত-পা টন টন করতে লাগলো, সে যন্ত্রণা যেন অসহ্য একেবারে।

কতক্ষণ এ অবস্থায় কাটানো যায়! হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় বড় কষ্ট বোধ হচ্ছিলো। মিঃ আহাদ এবং রহমত কষ্ট সহ্য করে চুপ ছিলেন কিন্তু ইউসুফ আলী কান্না শুরু করে দিলো।

সমস্ত রাত কেটে গেলো।

পরদিনও তাদের জাহাজ চলেছে। কোথায় যাচ্ছে তারা জানে না। শুধু একটানা ঝকঝক শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না। সমুদ্রের গর্জন মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হচ্ছে এইমাত্র।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে কিন্তু কোনো উপায় নেই। তাদের তিনজনকে ঐ ছোট্ট ক্যাবিনটার মধ্যে বন্দী করে রেখে ওরা চলে গেছে, তারপর কেউ আসেনি আর সন্ধান নিতে। কি অসহ্য মুহূর্তগুলো কাটছে তাঁদের। প্রতি দণ্ড তাঁদের কাছে এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। মিঃ আহাদ ভাবতে পারেননি এত তাড়াতাড়ি তাঁদের অদৃষ্টে এমন একটা ঘুরালো অবস্থা নেমে আসবে। তবে তিনি যাত্রার প্রারম্ভেই জানতেন, যে কোন মুহূর্তে তাঁকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

সেই দিনটাও কেটে গেলো তাদের নিঃসঙ্গ অবস্থায়, আবার রাত্রি এলো। ক্যাবিনের বাইরে আলো জ্বলে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে তাদের।

দুর্বিসহ যন্ত্রণা।

মিঃ আহাদ, রহমত এবং ইউসুফ আলীর হাত-পা গুলো ফুলে উঠেছে, ব্যথায় টন টন করছে যেন।

পরদিন জাহাজ কোথাও নোঙ্গর করেছে বলে মনে হলো তাদের, কারণ জাহাজ চলার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ক্যাবিনের বাইরে লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ভাষা অদ্ভুত, কিছু বোঝার উপায় নেই।

অবশ্য এটা মিঃ আহাদ, রহমত এবং ইউসুফ আলী প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁদের যখন বন্দী করা হয় তখন ওদের কথাবার্তার একটি বর্ণও বুঝতে পারেন নি তাঁরা।

দরজা খুলে গেলো।

ক্যাবিনে প্রবেশ করলো কয়েকজন বলিষ্ঠ ভীষণ চেহারার লোক। এক একজনের মুখে অদ্ভুত ধরনের চুনকালির প্রলেপ। সমস্ত দেহেও বিচিত্র ধরনের পোশাক। ওরা ক্যাবিনে প্রবেশ করেই হেঁচকা টানে তিনজনকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো, তারপর টেনে নিয়ে চললো ক্যাবিনের বাইরে।

ক্যাবিনের বাইরে এসে দাঁড়াতেই তাদের দেহগুলো বিষে টন টন করে উঠে। বিশেষ করে হাত দুখানা যেন আরষ্ট হয়ে গেছে। তবু হিমেল হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না। এতক্ষণ ক্যাবিনের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো।

ওরা প্রাণভয়ে নিঃশ্বাস নিলো এবার।

কিন্তু সে মাত্র কয়েক মিনিট। বন্দী তিনজনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

মিঃ আহাদ ডিটেকটিভ। তাঁর কাজের মাধ্যমে জীবনে বহু বিপদের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন কিন্তু এমন বিপর্যয় আসেনি। বিপদ এসেছে তাঁর সম্পূর্ণ অজান্তে, তাই তিনি অকস্মাৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন।

মিঃ আহাদ, রহমত এবং ইউসুফ আলীকে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হলো নিচে। মিঃ আহাদ দেখলেন সমুদ্রতীর থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ছোটবড় পর্বতের চূড়া বা শৃঙ্গ নজরে পড়ে। সমুদ্র যেন পর্বতের পাদমুলে আছাড় খেয়ে মাথা কুটে নিজেদের অন্তরের ব্যথা জানাচ্ছে। দৃশ্য মনোরম কিন্তু অনুভব করার অনুভূতি নেই তখন তাদের।

তিন জনকে বেঁধে নিয়ে চললো কয়েকজন লোক। আর বাকি সবাই জাহাজে ফিরে গেলো। তাদেরকে কোথায় নিয়ে চলেছে, কি ওদের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারে না তারা। কথাবার্তাও এক বর্ণ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

মিঃ আহাদ জানেন, তাঁদের ভাষাও ওরা বুঝবে না, তাই তিনি রহমত এবং ইউসুফের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলছিলেন।

মিঃ আহাদ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে যখন পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন তিনি বললেন—না জানি এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিণতি কি কে জানে।

রহমত বললো—মিঃ চৌধুরী, আমাদের জন্য দুঃখ করি না, দুঃখ আপনার জন্য। আপনার কষ্ট সত্য আমি সহ্য করতে পারছি না।

ইউসুফ আলী তো কেঁদেকেটে অস্থির, কারণ সে বুঝতে পেরেছে মৃত্যু তাদের অনিবার্য। এমন একটা বিপদ ঘটবে সে কল্পনা করতে পারেনি।

মিঃ আহাদ নানাভাবে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেও কোনো ফল পাচ্ছেন না, কারণ তাঁর প্রবোধ বাক্য দেহের যন্ত্রণাকে কিছুই লাঘব করতে পারছে না।

কাজেই নীরব সবাই।

ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন মিঃ আহাদ এবং তার সঙ্গীদ্বয়। পর্বতমালার গা বেয়ে একটি পথ চলে গেছে উপরের দিকে, সেই পথ ধরে ওরা তাঁদের তিনজনকে নিয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে ইউসুফ আলী হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওরা টেনে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সুউচ্চ পর্বতমালার উপরিভাগ লক্ষ্য করে এগুচ্ছে তারা। মিঃ আহাদের সুন্দর বলিষ্ঠ মুখমণ্ডল গম্ভীর ব্যথামলিন মনে হচ্ছে। যিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিজকে সব সময় ধীর স্থির মজবুত রাখতেন, এবার তিনিও যেন মুষড়ে পড়েছেন। রাণীকে উদ্ধার করার চিন্তা যেন লোপ পেয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। হয়তো জীবনটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

রহমত মিঃ আহাদের জন্য বেশি চিন্তিত-ব্যথিত হয়ে পড়েছে, কারণ সে-ই তাঁকে দস্যুরাণীর সন্ধানে ঝাম থেকে নিয়ে এসেছে। এজন্য নিজের ব্যথাকষ্ট ভুলে বারবার সে উচ্চারণ করছিলো—মিঃ চৌধুরী, আপনাদের এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

রহমতের কথায় মিঃ আহাদের ব্যথাকাতর সুন্দর মুখ স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠে, তিনি বলেন—সবই আমাদের অদৃষ্ট রহমত, তুমি মিছামিছি এ ব্যাপারে দুঃখ করছো। দেখা যাক এর শেষ কোথায়!

মিঃ চৌধুরী, আপনার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না, আপনার সুন্দর বাহু দুটি কালো হয়ে উঠেছে ব্যথায়।

মিঃ আহাদের মুখে তেমনি দীপ্তময় হাসির আভাস, তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন—আমার চেয়ে তোমাদের ব্যথা মোটেই কম নয়, রহমত। আমি জানি তোমাদের কষ্ট আরও তীব্র.....

মিঃ আহাদ, রহমত এবং ইউসুফকে নিয়ে ওরা তখন বেশ উঁচুতে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু সমতল জায়গা, তারপরই আবার খাড়া পথ উঠে গেছে উপরের দিকে। একপাশে পর্বতের গা, অপর দিকে হাজার হাজার ফুট গভীর খাদ।

ইউসুফ আলীর মুখে কথা নেই। তার মুখমণ্ডল মৃতের মুখের ন্যায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। গভীর খাদ লক্ষ্য করে শিউরে উঠছিলো সে।

রহমত এবং মিঃ আহাদের মনেও যে দারুণ একটা উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে, এটা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এরা মনোভাবকে মুখোভাবে প্রকাশের সুযোগ দেননি, এইমাত্র। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ঘাবড়ে গিয়ে লাভ কি।

মিঃ আহাদ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে ওরা যখন পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো তখন দস্যুরাণী তার গুহার ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেয়েছিলো তার চির আকাঙ্খিত মিঃ আহাদ চৌধুরীকে।

মিঃ আহাদকে দেখার পর থেকে তার মনে একটা তোলপাড় শুরু হয়েছিলো। নিজের জন্য দুঃখ তার ছিলোনা তেমন কিছু, কিন্তু ওরা কারা মিঃ চৌধুরীকে যারা বন্দী করে নিয়ে গেলো। বারবার মিঃ চৌধুরীর বিমর্ষ মলিন মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো ওর চোখের সম্মুখে। সেই সৌম্য সুন্দর বলিষ্ঠ মুখখানা যেন বড় ব্যথাকাতর মনে হলো।

দস্যুরাণীর মনের অস্থিরতা বেড়ে গেলো ভীষণভাবে। কোনোক্রমে সে যদি এই মুহূর্তে এই গুহা থেকে বের হতে পারতো তবে সে নিরস্ত্র হলেও দেখে নিতো, বিশেষ করে অনুসরণ করতো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে। কিন্তু সে নিরুপায়, তার বের হবার কোনো পথই নেই এ গুহা থেকে। এই দণ্ডে যদি বনহুরটা আসতো তবু তাকে অনুরোধ করে জানাতো মিঃ আহাদকে মুক্ত করার কথাটা। একবার মিঃ আহাদের মুখেই শুনেছিলো দস্যুরাণী, ওর সঙ্গে নাকি পরিচয় আছে তাঁর। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতেই একবার তিনি এসেছিলেন কান্দাই শহরের নিকটবর্তী কোনো এক জায়গায়। সেখানে দস্যু বনহুর আর মিঃ আহাদ চৌধুরীতে হয়েছিলো পরিচয়। উভয়েই জানতে পেরেছিলো উভয়কে, চিনেছিলো ভালভাবে। শেষ পর্যন্ত মিঃ আহাদ বনহুরকে জানতে পেরেও গ্রেপ্তার করেননি, বরং উভয়ে উভয়কে বন্ধু হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই বনহুরকে বললে সে তার অনুরোধ ফেলতে পারতো না কিন্তু কোথায় সেই বনহুর—এখন কোথায় আছে সে কে জানে!

ঠিক ঐ মুহূর্তে যদি পাথরখানা সরে যেতো তাহলে দস্যুরাণী ধন্য হতো, সার্থক হতো সে। যেমন করে হোক বনহুরকে সে মানিয়ে নিতো তার আহাদ চৌধুরীর মুক্তির ব্যাপারে কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি পায়!

দস্যু বনহুর তখন কান্দাই আস্তানায়। নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

নূরী ওর চুলে আংগুল চালিয়ে দিতে দিতে বললো—দস্যুরাণীর বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসেছো এটা তোমার জয় নয় হুর পরাজয়।

কারণ?

কারণ পালানোটা.....

বীরের কাজ নয়, এই তো বলতে চাচ্ছো?

হাঁ, তুমি লৌহকারাগার থেকে যেভাবেই পালাও না কেন, তা তোমার জন্য সমীচীন নয়। আমি জানি তুমি পালাতে পারো না, তুমি যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে জয়ী হবে।

নূরী, তোমার বিশ্বাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। দস্যুরাণীর লৌহকারা কক্ষ থেকে পালিয়ে এলেও তাকে না জানিয়ে আসিনি....

বলো কি, তাকে জানিয়ে তারপর এসেছো? আসতে দিলো সে...

তাকেও যে সঙ্গে এনেছি!

দস্যুরানীকে তুমি....

হাঁ, তাকেও এনেছি নূরী।

কোথায়? কোথায় সে?

কুহেলি পর্বতের এক গোপন গুহায়।

কুহেলি পর্বত! সে আবার কোন্ পর্বত হর? আমি তো কোনোদিন এ নাম শুনিনি? কোথায় কোন্ জায়গায় এই কুহেলি পর্বত বলবে আমাকে?

নিশ্চয়ই বলবো কিন্তু আজ নয়।

না, তোমাকে আজই বলতে হবে। আর বলতে হবে দস্যুরাণীকে তুমি অন্য কোনো জায়াগায় না রেখে সেই কুহেলি পর্বতে....

কেন রেখেছি এই তো?

হাঁ। তবে আমি জানি, তুমি বহুদিন থেকে দস্যুরানীর সন্ধান করে ফিরছো কিন্তু কেন বলো তো তার এত খোঁজ?

হাসলো বনহুর, কোনো জবাব দিলো না।

নূরী বনহুরের চিবুকে নাড়া দিয়ে বললো—কি, চুপ রইলে কেন? সত্যি বলিনি আমি?

হ্যাঁ, সত্যি বলেছো।

কিন্তু কেন? শেষ পর্যন্ত দস্যুরাণীর প্রেমে.....

নূরী।

মিথ্যে নয়, তুমি আজকাল কেমন হয়ে গেছো, ঠিক আগের মত আর নেই।

আসলে তোমার মনের পরিবর্তন হয়েছে, আমার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তাই তোমার এমন মনোভাব নূরী।

না, যা বলেছি সত্য। তুমি আজকাল মনিরা আপা এবং নূরের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছো, ভুলে গেছো তুমি নিজের মায়ের কথা—বলো সত্যি না মিথ্যা বলেছি আমি।

বহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো, এবার সে উঠে বসলো, বালিশটা টেনে নিলো সে কোলের মধ্যে, তারপর বললো—তুমি যা বললে সত্যি নয় নূরী। হয়তো বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ায় ঠিকমত তাদের ওখানে যেতে পারি না, তাই বলে কি ভুলে গেছি? না না ভুলিনি, কোনো সময়ের জন্য ভুলতে পারি না নূরী। মা-মায়ের স্নেহ থেকে শিশুকাল হতে বঞ্চিত ছিলাম। সেই মায়ের স্নেহ পেয়েছি, তাকি ভোলার?

তবে কতদিন তুমি সেখানে যাওনা বলো তো?

যাবো, কাজ অনেকটা শেষ হয়েছে।

ঐ যে বললে তুমি দস্যুরাণীকে বন্দী করে রেখেছো কুহেলি পর্বতের কোন্ গোপন গুহায়?

হাঁ, কিন্তু সেটা তেমন কোনো কাজ নয়। ঐ মেয়েটি দস্যুরাণী হিসেবে অদ্বিতীয়া, এটাই ছিলো তার গর্ব, আমি তার গর্ব চূর্ণ করে দিয়েছি। অবশ্য শুধু সেটাই একমাত্র কারণ নয়—দস্যুরাণীর উদ্দেশ্য আমাকে বন্দী করা এবং তার বান্ধবী হীরাবাঈয়ের নিকটে সমর্পণ করা....

তার মানে? দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বলে নূরী।

বনহুর একটা সিগারেট ধরালো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—হীরাবাঈ দস্যুরাণীর বান্ধবী। সে আমাকে ভালবাসতো...

হীরাবাঈ তোমাকে ভালবাসতো।

হাঁ।

অভিমানভরা কণ্ঠে বলে নূরী—হীরাবাঈয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কি করে এবং সে তোমাকে ভালই বা বাসলো কোন্ অধিকারে? এর জবাব তোমাকেই দিতে হবে হুর।

তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ এই দুটি প্রশ্নই আমার অজ্ঞাত।

ন্যাকামি চলবে না, তোমাকে বলতেই হবে।

সত্যি?

হ্যাঁ, না বললে তোমার সঙ্গে কোনো কথাই বলবো না।

ও, তা হলে তো বড় মুস্কিল।

তামাশা করোনা হুর, জবাব দাও, যে দুটি প্রশ্ন আমি করেছি তার সঠিক জবাব দাও।

তবে শুনবেই—শোন, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো, একবার জাহাজ ডুবিতে জাহাজের অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাই সমুদ্রের অতলে। ভীষণ সাইক্লোনের দাপটে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচানো কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমারও নয়, যদিও আমি, সাঁতারে কয়েকবার তোমাকে পরাজিত করেছিলাম।

ওসব শুনতে চাই না, আসল কথা বলো?

হাঁ, তাই বলছি। ঝাম এবং ঝিন্দ রাজ্যের রাজকুমারী হীরাবাঈ সূর্য উদয়ের পূর্বে প্রতিদিন সখী পরিবেষ্টিত হয়ে সমুদ্রতীরে যেতো স্নান করতে। স্নান করে ফিরে আসতো তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে, যাতে কোনো পুরুষের মুখ দর্শন না ঘটে, কারণ হীরাবাঈ ছিলো বাল্যবিধবা।

অবাক হয়ে শুনছিলো নূরী তার কথাগুলো।

বললো বনহুর—খুব আশ্চর্য হচ্ছো, না? তা আশ্চর্য হবার কথাই বটে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে বাল্যবিধবার পুরুষের মুখ দর্শন করা মহাপাপ এবং সে কারণেই মহারাজ কন্যার প্রতি কঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সে কোনোক্রমে পুরুষের মুখ দর্শন না করে।

ভূমিকা রেখে আসল কথাটা বলো এবার?

ভূমিকা না জানিয়ে আসল কথাটা বললে তোমার পছন্দ হবে না যা বিশ্বাস করতে চাইবে না, তাই ভূমিকার আশ্রয় নিয়েছি। প্রতিদিনের মত হীরাবাঈ তার বান্ধবী পরিবেষ্টিত হয়ে সমুদ্রতীরে গমন করলো। পূর্ব রাতেই ভীষণ ঝড় হয়ে গেছে যাকে বলে সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন। হীরাবাঈ বান্ধবী সহ সমুদ্রতীরে গমন করে দেখলো একটি লোক অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সমুদ্রতীরে বালুকারাশির মধ্যে।

তারপর?

তারপর বান্ধবীসহ রাজকুমারী হীরা দয়াপরবশ হয়ে নিয়ে এলো তাকে রাজপ্রাসাদে, তবে প্রকাশ্য অবস্থায় নয়, গোপনে এবং লুকিয়ে রাখলো রাজকুমারীর গোপন অন্তঃপুরে।

সেই লোকটি তুমি—মানে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হাঁ, তা বুঝতেই পারছো। হীরাবাঈ এবং তার বান্ধবীদের প্রচেষ্টার রক্ষা পেলাম, মানে জীবনলাভ করে দেখলাম তার চেয়ে মৃত্যু ছিলো শ্রেয়.....

মিথ্যা কথা!

সত্যি তুমি বিশ্বাস করো আমি হাঁপিয়ে উঠলাম, দেখলাম একরাশ মেয়ের মধ্যে আমি একটিমাত্র পুরুষ। সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ব্যাকুল আগ্রহে। সবার মুখেই উদ্বিগ্নতার ছাপ— আমি আরোগ্যলাভ করবো কিনা সবার মনে সন্দেহ ছিল। আমাকে চোখ মেলতে দেখে সবাই খুশি হলো।

সেটাতো তোমারও খুশির কথা ছিলো?

মোটেই না, একসঙ্গে এতগুলো শ্যেন দৃষ্টির কাছে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, কিন্তু রেহাই পেলাম না। ওরা আমাকে.......

থামলে কেন বলো; ওরা তোমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করতে লাগলো বুঝি?

দেবতাও বলতে পারো, খেলার পুতুলও বলতে পারো। দিনের বেলায় আমাকে অন্তঃপুরের গোপন এক কক্ষে লুকিয়ে রাখতো আর রাতের বেলায় ওরা সবাই এসে ভিড় জমাতো আমার চারপাশে। তবে হীরাবাঈ আমাকে অধিকার করে নিয়েছিলো সবার কাছ থেকে। কদিন যেতেই বুঝতে পারলাম হীরা আমাকে ভালবেসে ফেলেছে ...... এই হলো হীরার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং তার ভালবাসার অধিকার।

নূরী গম্ভীর মুখে বললো—বুঝলাম তাহলে হীরাবাঈকে তুমিও ভালবেসেছিলে?

হাঁ, বেসেছিলাম.....

তবে তুমি যে বলেছিলো হীরাবাঈয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

না, ছিলো না এবং নেইও......

তবে যে বললে তুমি তাকে ভালবেসেছিলে?

ভালবাসা পাপ বা অপরাধ নয়। সুন্দরকে মানুষ ভালবাসে। যেমন ধরো একটি সুন্দর ফুলকে মানুষ ভালবাসে। তেমনি আমি হীরাবাঈকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু হীরাকে পাবার জন্য নয়......

আমি জানি ..... আমি জানি তুমি কত পবিত্র। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

বনহুর বললো—আমি বহুদিন তোমাকে বলেছি আমার উপর বিশ্বাস রাখবে।

হাঁ, তোমাকে আমি চিরদিন বিশ্বাস করি।

তুমি একটু পূর্বেই জানতে চেয়েছো দস্যুরাণীকে আমি অন্য কোথাও বন্দী করে না রেখে কুহেলি পর্বতে কেন রেখেছি।

যদি কোনো অসুবিধা থাকে তবে বলোনা।

না, অসুবিধা নেই তবে বলাটা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি। কারণ দস্যুরাণীর সন্ধানে তার অনুচরগণ সমস্ত জায়গা চষে ফিরছে, মানে সমস্ত পৃথিবী ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরছে। নূরী, আমি তাই কুহেলি পর্বতের কোনো এক শৃঙ্গের গোপন গুহায় ওকে আটকে রেখেছি। সে চেয়েছিলো আমাকে বন্দী করে শায়েস্তা করবে...... অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, হাসি থামিয়ে বলে উঠলো—তারপর প্রিয় সখীর হাতে সে আমাকে সমর্পণ করবে যৌতুক হিসেবে, বুঝেছো নূরী....তাই আমি তাকে বুঝিয়ে দেবো তার চিন্তাধারা কতখানি ন্যায়সঙ্গত ছিলো।

বনহুরের কথাগুলো বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো নূরী, বললো সে এবার—দস্যুরাণীকে তাহলে সহজে মুক্তি দিচ্ছো না তুমি?

যতদিন না সে তার রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমার হাতে অর্পণ করেছে ততদিন সে মুক্তি পাবে না।

রক্তে আঁকা ম্যাপ!

হাঁ, সে এক অদ্ভুত ম্যাপ যা সম্পূর্ণ রক্তে আঁকা। ম্যাপখানা অনেক কষ্টে, অনেক সাধনায় সংগ্রহ করেছিলেন মিঃ বার্ড।

মিঃ বার্ড? তিনি কে এবং কোন্ দেশের বাসিন্দা? অবাক হয়ে বললো নূরী?

বনহুর তার আংগুলের ফাঁক থেকে দগ্ধ সিগারেটটা পাশের টেবিলে রক্ষিত এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে পুনরায় নতুন একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। একরাশ ধোঁয়া নির্গত করে বললো —মিঃ বার্ড হলেন হিসাগো হার্ম শহরের বাসিন্দা। তিনি একজন খাঁটি ইংরেজ। রক্তে আঁকা ম্যাপখানা তিনি পেয়েছিলেন কোহেন পর্বতের কোনো এক গুহার মুমূর্ষ এক ব্যক্তির কাছে। রক্তে আঁকা ম্যাপ নিয়ে সন্ধান চালানোর সময় প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ আহাদ চৌধুরী মিঃ বার্ডকে সহায়তা করেছিলেন সর্বতোভাবে। ঐ মুহূর্তে মিঃ আহাদ চৌধুরীকে সাহায্য করেছিলো স্বয়ং দস্যুরাণী...

তারপর?

জয়ী হয়েছিলেন মি বার্ড এবং আহাদ চৌধুরী। রক্তে আঁকা ম্যাপের সংকেত অনুযায়ী তাঁরা দুর্গম পথ অতিক্রম করে একদিন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং লাভ করেছিলেন সেই রক্তে আঁকা ম্যাপের রত্নগুহা!

"রত্নগুহা

হাঁ, সেখানে আছে সবচেয়ে মূল্যবান রত্নসম্ভার যা পৃথিবীর কোনো জায়গায় নেই। নূরী, শুনে রাখো, সেই রত্নসম্ভারের গুপ্তগুহা এখন দস্যুরাণীর আয়ত্তে।

কেন, মিঃ বার্ডই তো ঐ রক্তে আঁকা ম্যাপ নিয়ে সন্ধান চালিয়ে অতিকষ্টে আবিষ্কার করেছিলেন সেই রত্নসম্ভারের গুপ্তগুহা?

হাঁ, সে কথা সত্য কিন্তু দস্যুরাণীর বাবা দস্যু মরেনও ঐ রক্তে আঁকা ম্যাপের সন্ধানে তাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধানলাভও করেছিলো সে। মিঃ আহাদ চৌধুরীর বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রথমে সে

পারেনি কিছু করতে। কিন্তু পরে সে মিঃ বার্ডকে হত্যা করে রক্তে আঁকা ম্যাপখানা দস্যু মরেন হস্তগত করেছিলো।

বলো কি হুর?

হাঁ, মিঃ বার্ডকে মরেন হত্যা করে রক্তে আঁকা ম্যাপ হস্তগত করেছিলো কিন্তু মরেন কন্যা দস্যুরাণী পিতার এই অন্যায় বরদাস্ত করতে পারেনি। সে কৌশলে রক্তে আঁকা ম্যাপ নিজে সরিয়ে নিয়েছিলো অতি গোপনে। মরেন তখন খুনের সাধনায় ব্যস্ত ছিলো, তাই সে টের পায়নি। যখন টের পেয়েছিলো রক্তে আঁকা ম্যাপ তখন তার হস্তচ্যুত হয়ে গেছে।

তারপর? তারপর?

মরেন খুনের নেশায় উন্মত্ত। সে প্রতিদিন একজন লোককে হত্যা করে চলেছে— তার উদ্দেশ্য একটি ওষুধ আবিষ্কার করা এবং সে ওষুধটির কাজ হলো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা। একটি ইনজেকশান সে তার পেসেন্টকে করতো, ঐ ইনজেকশানের পর পেসেন্টের মৃত্যু ঘটতো। সঙ্গে সঙ্গে মরেন তার আবিষ্কৃত ইনজেকশানটা মৃত পেসেন্টের বুকের দক্ষিণ পাশের ফুসফুস পুশ করতো। কিন্তু মরেনের আবিষ্কৃত ওষুধ কার্যকরী না হওয়ায় শুধু সে হত্যাই করে চল্লো, একটি পেসেন্টও জীবন লাভে সক্ষম হলো না। প্রতিদিন শহরের রাজপথে একটির পর একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। পুলিশ মহল হন্তদন্ত হয়ে খুঁজেও খুনীকে আবিষ্কার করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত মিঃ আহাদ একদিন এক মজুরের বেশে মরেনের অর্থাৎ সেই খুনের সাধকের গবেষণাগারে গিয়ে হাজির হলেন। খুনের সাধক তাঁকে চিনতে পারলো না, মনে করলো সে একজন সাধারণ শ্রমিক মজুর। আনন্দে আত্মহারা হলো খুনের সাধক, কারণ তাকে সেদিন আর পেসেন্ট খুঁজতে যেতে হলো না।

তারপর? আচ্ছা হুর, তুমি এত জানলে কি করে?

জেনেছি মিঃ আহাদ চৌধুরীর কাছে, তিনিই কাহিনীটা আমাকে শুনিয়েছিলেন মিস্টার হুর। হাঁ, তারপর মিঃ আহাদ চৌধুরীকেই নিয়ে গেলো খুনের সাধক তার গবেষণাগারে। সেদিন মিঃ চৌধুরী মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন— সে কাহিনী আরও অদ্ভুত!

এতই যদি বললে তবে আর একটু বলো না শুনি।

বনহুর বলে চললো—মিঃ আহাদ চৌধুরী বলেছিলেন, খুনের সাধক তাঁকে যখন টেবিলে শুইয়ে তাঁর বুকের কাছে সিরিঞ্জ নিয়ে এলো তখন তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন, কারণ ইনজেকশানটা তাঁর বুকে পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাঁর অনিবার্য......

কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ছিলো সেটা।

হাঁ নূরী, অতি ভয়ঙ্কর মুহূর্তই বটে। মিঃ আহাদ চৌধুরী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে একটি টেলিফোনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। যে টেলিফোনটা তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রতিটি মুহূর্ত এক একটা যুগ মনে হচ্ছিলো তখন তাঁর কাছে। বুকটা তাঁর প্রচণ্ডভাবে টিপ টিপ করছিলো। তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়েছিলেন টেবিলের উপরে। খুনের সাধক সিরিঞ্জটা নিয়ে এলো তাঁর বুকের কাছে......আর এক সেকেণ্ড, তাহলেই সিরিঞ্জের সূঁচটা বিদ্ধ করে দেবে খুনের সাধক তাঁর বুকে, ঠিক ঐ দণ্ডে পাশের রুমে টেলিফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে। একটানা বেজে চলেছে অবিরাম গতিতে। খুনের সাধক বিরক্তি বোধ করলো সাধক পাশের রুমে গিয়ে ফোন ধরলো তখন মিঃ চৌধুরী সিরিঞ্জ থেকে বিষাক্ত ওষুধ ফেলে দিয়ে নিজের নিয়ে যাওয়া একটি ভিটামিন এম্পেল ভেঙ্গে ভরে নিলেন দ্রুতহস্তে সিরিঞ্জে, তারপর যেমন শুয়েছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন চুপচাপ। ফিরে এলো খুনের সাধক এবং সে তাড়াতাড়ি সিরিঞ্জের ওষুধটা পুশ করে দিলো পেসেন্টের বুকে।

কি সাংঘাতিক কাণ্ড!

হাঁ, সাংঘাতিকই বটে।

তারপর কি হলো?

মিঃ আহাদ চৌধুরী দক্ষ ডিটেকটিভ, তিনি মৃতের ভান করলেন।

খুনের সাধক তাঁকে কি করলো?

তার মৃত্যু ঘটলো মনে করে দ্বিতীয় সিরিঞ্জের ওষুধটা তাড়াতাড়ি পুশ করলো পেসেন্টের বাম বক্ষে। ওটা ছিলো খুনের সাধকের নিজের আবিষ্কৃত

ওষুধ, যে ওষুধ নিয়ে খুনের সাধক তার সাধনা চালিয়ে চলেছে। মৃতকে জীবিত করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। ঐ ওষুধটা মিঃ চৌধুরীর বুকে পুশ্ করায় তিনি নাকি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বুকে তবে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তিনি যেমন মৃতের ন্যায় পড়েছিলেন তেমনি রইলেন। খুনের সাধক মনে করলো এবারও সে ব্যর্থ হয়েছে, তাই রাতের অন্ধকারে মৃত শ্রমিকের লাশ ফেলে দিয়ে এলো নিভৃত এক জায়গায়।

কি আশ্চর্য?

হাঁ নূরী, বড় আশ্চর্য ঘটনা এবং মিঃ আহাদ চৌধুরী নিজের জীবন বিপন্ন করে আসল খুনিকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু......

কিন্তু কি বলো, থামলে কেন?

খুনের সাধককে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি, সে বিষাক্ত ট্যাবলেট খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। সেই খুনীর সাধকই হলো দস্যু মরেন এবং রক্তে আঁকা ম্যাপখানা ছিলো তারই কাছে। এখন সেই ম্যাপখানা দস্যুরাণীর হস্তগত হয়েছে। একটু থেমে বললো বনহুর—ঐ ম্যাপখানা আমার চাই।

সে কারণেই তুমি তাহলে দস্যুরাণীকে বন্দী করেছো?

হাঁ নূরী, সে যতদিন আমাকে রক্তে আঁকা ম্যাপ না দেবে ততদিন আমি তাকে কুহেলি পর্বতে আটক রাখবো। বনহুরের চোখ দুটো তীব্র উজ্জল হয়ে উঠে বলে সে—ঐ সম্পদ আমার হাতে এলে লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ অসহায় মানুষকে বাঁচাতে পারবো। নূরী, দেশের জনগণ আজ মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে শত শত মানুষ আজ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, নানারকম রোগ দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে। মৃত্যু এখন তাদের সাথী....

এমন সময় রহমান দরজার বাইরে এসে বলে উঠে—সর্দার, আসতে পারি?

বনহুর বললো—এসো।

রহমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো—কি সংবাদ রহমান?

সর্দার, জাম্বুল থেকে সংবাদ এসেছে সেখানের অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন। দুর্নীতিবাজ আর চোরাকারবারীতে দেশ ছেয়ে গেছে, অচিরে সেখানে আপনার যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের লোকের চেয়ে সে দেশের অবস্থা বড় সংগীন।

হাঁ, কিছুদিন পূর্বে আমি এ সংবাদ জানতে পেরেছিলাম রহমান, ভেবেছিলাম নিজের দেশ দুর্নীতি মুক্ত না করে অন্য দেশে যাবো না কিন্তু যেতেই হবে।

সর্দার, দেশের চোরাকারবারী আর দুর্নীতিবাজ যারা মাথা উঁচু করা শয়তানের দল ছিলো তাদের সবাই প্রায় খতম হয়েছে। যারা আত্মগোপন করে কাজ করছে, তারাই অতি সাবধানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

রহমান?

বলুন সর্দার?

দিপালীর সন্ধান পেয়েছিলেন?

না সর্দার।

বনহুরের চোখ দুটো উদাস দৃষ্টিতে ভরে উঠলো। একটু চিন্তা করে বললো বনহুর—না জানি বেচারী এখন কোথায়? তাকে কিভাবে রাখা হয়েছে, কি অবস্থায় আছে সে.... গলাটা ধরে আসে বনহুরের। একটু থেমে বলে—রহমান, প্রথমে আমি দিপালীকে উদ্ধার করতে চাই, তারপর অন্য কাজ।

নূরী স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। সে মুখে দেখতে পায় কঠিন শপথের দৃঢ়তার আভাস।

❑

আর কতদিন তুমি তোমার সেই প্রিয় নাগরের কথা স্মরণ করে বাঁচতে চাও মিস দিপালী? জবাব দাও, কতদিন তুমি এমনি করে বাঁচবে বলো?

ক্ষতবিক্ষত দেহের যন্ত্রণায় মুখমণ্ডল বিকৃত করে হাঁপাচ্ছিলো দিপালী। তার দেহের নানাস্থানে কষাঘাতের আঘাতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিলো,

সেগুলো থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। চোখ দুটো কোটরাগত। চোখের নীচে জমে উঠেছে কালো কালিমার ছাপ। চুল রুক্ষ এলোমেলো, দেহের বসন ছিন্ন ভিন্ন উলঙ্গ প্রায়। চোখ দুটো শুধু তেজোদীপ্ত, এতটুকু ম্লান হয়নি সে চোখের চাহনি। দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

দিপালী শয়তানটার কথায় জবাব দেয় না। সে মুখ তুলে একবার দেখে নেয় ওকে।

লোকটা পুনরায় বলে উঠে—যদি বাঁচতে চাও, জীবন রক্ষা করতে চাও, তবে ঐ দস্যুটার কথা ভুলে যাও এবং এসো আমাদের কাজে সহায়তা করো।

না, আমি তোমাদের পাপকাজে সহায়তা করবো না, করতে পারবো না।

তবে এভাবে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করো।

তাই করবো তবু আমি তোমাদের কাজে সহায়তা করবো না।

মরবে তবু আমাদের কথায় রাজি হবে না। বেশ......গুরুদাস?

একটি লোক এগিয়ে আসে—বলুন মালিক?

নিয়ে যাও একে, আবার বন্দী করে রাখো সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম কুঠিরে। কেউ যেন কোনোদিন ওর সন্ধান না পায়। যেমন জাহানারাকে কেউ খুঁজে পায়নি, পাবেও না। পুলিশ বাহিনী বহুদিন থেকে আমাদের সন্ধান করে ফিরছে কিন্তু জানি, তারা কোনোদিন আমাদের আড্ডাখানার সন্ধান পাবে না। আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত, তবে মিঃ বেলালী কিছুটা তীব্রভাবে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে শায়েস্তা করতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। তবে জানতে পেরেছি, দস্যু বনহুর নাকি ফিরে এসেছে মন্থনা দ্বীপ থেকে, ভয় তাকেই....

দিপালীর কানে কথাগুলো পৌঁছলো। তার মুখমণ্ডল খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বলে উঠলো সে—কেন, তাকে ভয় কেন? ভয় তোমরা কাউকেই করো না তবে তাকে ভয় কেন করলে? মনে রেখো শয়তানের দল, ওর হাত থেকে তোমরা কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

চুপ করো শয়তানী, এই মুহূর্তে তোমার কণ্ঠ চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিতে পারি কিন্তু দেবো না, কারণ তোমার মত মেয়ে আরও দরকার।

একদিন তুমি জাহানারা এবং আরও যারা শয়তানদের বন্দীশালায় আটক আছে তারা সবাই আমাদের প্রাধান্য স্বীকার করবে। যাও গোলাম, একে নিয়ে রাখো বন্দীশালায়।

দিপালীকে টেনে নিয়ে চললো প্রহরী শয়তান লোকটি আবার সেই দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাকক্ষে। দিপালীকে ধাক্কা দিয়ে সেই কারাকক্ষে ঠেলে দিয়ে চলে গেলো লোকটা।

দিপালী মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। যন্ত্রণায় মুখমণ্ডল বিকৃত হলো। তবু তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো না। আজ সে জানতে পেরেছে তার রাজকুমার জ্যোতির্ময় দেশে ছিলো না, সে কোথাও গিয়েছিলো এবং ফিরে এসেছে। নিশ্চয়ই ফিরে এসে তার সন্ধান করবে। সন্ধান করে জানতে পারবে দিপালী নেই, তাকে হরণ করা হয়েছে। কে বা কারা তাকে উধাও করেছে সে জানে না। নিশ্চয়ই সে তাকে খুঁজে বের করবে। জ্যোতির্ময় বেশে স্বয়ং দস্যু বনহুর তার সঙ্গে অভিনয় করেছিলো—না না, অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি তাকে সে ভালবেসেছিলো।

দিপালীর মুখে হাসি ফুটে উঠে।

এগিয়ে আসে একটি তরুণী, তাকেও এ কক্ষে আটক রাখা হয়েছে; অবস্থা তারও সংগীন। দেহের বসন ছিন্নভিন্ন, চুলগুলো এলোমেলো, মুখ মলিন পাংশুবর্ণ। শয়তানের দল তাকেও রেহাই দেয়নি। তার অপরাধ সে স্বেচ্ছায় শয়তানদের কুৎসিত লালসায় নিজকে বিলিয়ে দেয়নি। মালিক তাই তাকে কঠিন শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেছে। যত দিন সে আপন ইচ্ছায় তাদের লালসা পূরণ না করে ততদিন তাকে দুর্গম কারাকক্ষে আটক রাখবে। ওরই নাম জাহানারা। যদিও সে সম্রাটকন্যা জাহানারা নয়, তবু তার রূপ ছিলো কতকটা বাদশা জাদীদের মতই। শয়তান রশীদ হায়দার তাকে চুরি করে এনেছে বাড়ির বাইরে।

জাহানারা এসে বসলো দিপালীর পাশে। ওর ঠোঁটের রক্ত আঁচলে মুছে দিয়ে বললো—বোন, আজ কি হয়েছে তোমার? নির্যাতনের পরও তুমি যে হাসছো!

দিপালী চোখ দুটো ধীরে ধীরে তুলে ধরলো জাহানারার চোখে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললো—অনেক দিন হলো তুমি আমার পাশে আছো

জাহানারা, তুমিও আমার মতই একজন অসহায়া রমণী। তোমাকে না বললে আমার ভুল করা হবে। বোন, আজ আমার কিছু নেই-পিতা-মাতা ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি নিজের ইজ্জতও নেই আমার। আজ আমি নিঃস্ব রিক্ত.....

তবে হাসছো কেন দিপালী দিদি?

আছে একটি সম্পদ আমার আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি, পারবে না কোনোদিন।

কি সে সম্পদ দিপালী দিদি?

অমুল্য, যার কোনো দাম নেই জাহানারা। সে হলো আমার মনের সম্পদ। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো সেই সম্পদ মনের মনিকোঠায় আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবো। না না, আমি নিঃস্ব নই, আমি সর্বহারা নই। আছে অনেক যা লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যেও পাওয়া যায় না।

দিপালীর কথাগুলো যেন একটির পর একটি গিলছিলো জাহানারা। কি সে অমূল্য সম্পদ যা এই দুর্গম কঠিন অন্ধকার বিষাক্তময় কারাকক্ষেও দীপ্তময় করে তুলেছে। শুধু আজ নয, এমনি বহুদিন সে দেখেছে দিপালীকে হঠাৎ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতে। কি যেন সে ভাবে বসে বসে, মাঝে মাঝে খিলখিল করে হাসে, আবার কখনও কখনও বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে আপন মনে। জাহানারা জিজ্ঞাসা করলো কোনোদিন সে এর জবাব পায়নি দিপালীর কাছে।

আজ দিপালী যখন আপন মনেই বলতে চাইলো তখন জাহানারা উন্মুখ হয়ে উঠলো তার কথা শোনার জন্য।

দিপালী হঠাৎ উন্মাদিনীর মত হেসে উঠলো, তারপর বললো—সে এসেছে। কোথায় যেন গিয়েছিলো সে আবার ফিরে এসেছে—এবার নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজে বের করবে।

কে সে দিপালী দিদি?

ঐ তো বললাম যে আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে নিয়ে আছে সেই রাজকুমার?

রাজকুমার?

হাঁ, আমার হৃদয় রাজ্যের রাজকুমার সে, নাম ছিলো ওর জ্যোতির্ময়। আমার হৃদয়ের জ্যোতি সে কিন্তু তার আসল পরিচয় বড় অনেক বড়, অনেক মহান সে...

কে—কে সে দিপালী দিদি?

ঐ তো আমার হৃদয়ের মনি যাকে আমি বন্ধ করে রেখেছি আমার মনের মনিকোঠায়। সে এক অদ্ভূত মানুষ, অপরূপ তার সৌন্দর্য যার কোনো বর্ণনা হয় না।

কে সে দিপালী দিদি বলবে না আমাকে?

বলবো! সে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিলো। রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের বেশে সে আমাকে ধরা দিয়েছিলো। কিন্তু আসলে সে রাজকুমার জ্যোতির্ময় নয়, সে কে জানো জাহানারা?

না, জানবো কি করে, তাকে তো আমি দেখিনি কোনোদিন।

দিপালী নিজের চোখ দুটো মেলে ধরলো সম্মুখে। আধো অন্ধকারে ওর মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবু বুঝতে পারলো দিপালীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

জাহানারা বললো থাক, তুমি ব্যথা পেলে আমি জানতে চাই না।

তুমি জানতে না চাইলেও আমি বলবো তার কথা। সে যে আমার জীবন-ধন-মান-সম্পদ.....আমার মনের অলংকার......রাজকুমার জ্যোতির্ময় সে।

রাজকুমার জ্যোর্তিময়কে তুমি ভালবাসো?

ঠিক ভালবাসি কিনা বলতে পারি না তবে ওর স্মৃতিগুলো আমাকে জীবিত রেখেছে, না হলে সত্যি মরে যেতাম। গভীর রাতে অতি সংগোপনে সে আসে আমার পাশে ....

কৈই, আমি তো দেখতে পাইনা?

তোমরা কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সে যে শুধু আমার..... শুধু আমার আমিই শুধু দেখতে পাই ওকে....সেই সুন্দর দীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষ....গভীর নীল দুটি চোখ....অপরূপ সে পুরুষ....

দিপালী দিদি, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো! এ সব কি বলছো?

যা বলছি সব সত্যি, সব সত্যি, ওকে যদি তুই একবার দেখতিস কিছুতেই ভুলতে পারতিস না। জাহানারা, সে মানুষ নয়, সে দেবতা।

দিপালী দিদি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আজ তোমার মন ভুল নেই তাই আবল তাবল বকছো?

বিশ্বাস কর আমি মিথ্যা কথা বলিনি, আমি মিথ্যা কথা বলিনি....

কেঁদে উঠে দিপালী ব্যাথায় টন টন করছিলো ওর সমস্ত দেহটা। ক্ষতগুলো থেকে পঁচা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ওর।

সুন্দর স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী দিপালীকে আজ চেনা যায় না। তাকে দেখলে সত্যিই একটি পাগলিনী বলে মনে হয়, কিন্তু কেন আজ তার এ অবস্থা—এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

সমাজের মেরুদণ্ড সেজে যারা রাতের অন্ধকারে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছে তাদেরই চক্রান্তে আজ দিপালীর এ অবস্থা।

দিপালী চেয়েছিলো বাঁচতে এবং দেশের দশজনকে বাঁচাতে কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিলো না ওরা, যারা দেশের গোপন শত্রু।

অনেক সন্ধান চালিয়েও দিপালীকে খুঁজে পেলো না বনহুরের অনুচরগণ।

পুলিশ মহলও হিমসিম খেয়ে গেছে। বহু জায়গায় সন্ধান চালিয়েও তারা দিপালী জীবিত আছে, না তার মৃত্যু ঘটেছে, এটা আন্দাজ করতে পারলো না। মিঃ হেলালী এবং মিঃ জাফরী নিজেরাও দিপালীর সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছেন।

গোয়েন্দা বিভাগও এ ব্যাপারে গোপনে ছদ্মবেশে সমস্ত শহর তন্নতন্ন করে চষে ফিরছে। পুলিশ মহলের তো কথাই নেই।

মিঃ হেলালী সেদিন গভীর রাতে অফিসে বসে কাজ করছিলেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজার পর্দা ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো একটি লোক, হাতে তার আগ্নেয়াস্ত্র।

মিঃ হেলালী মনোযোগ সহকারে কাজ করছিলেন, হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই বিস্মিত হলেন কারণ এত রাতে তাঁর অফিসকক্ষে অপরিচিত ব্যক্তি এবং তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

এগিয়ে এলো লোকটা টেবিলের পাশে।

মিঃ হেলালী বললেন—কে তুমি? আমার বাড়ির ফটক পেরিয়ে এ অফিসরুমে প্রবেশ করলে কি করে?

লোকটার মুখে কালো রুমাল বাঁধা ছিলো। সে মুখ থেকে রুমালখানা খুলে ফেললো একটানে। দক্ষিণ হস্তের আগ্নেয়াস্ত্রখানা মুহূর্তের জন্য মিঃ হেলালীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলেনি সে। বললো লোকটা—আমাকে চিনতে পারবেন না, কারণ আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত...

তবে এখানে এলে কেন?

প্রয়োজন আছে বলে।

কি প্রয়োজন তোমার?

মিস দিপালীর সন্ধান করা বন্ধ করে দিন, নচেৎ মৃত্যু আপনার অনিবার্য।

সেজন্যই কি তুমি এসেছো?

হাঁ, তাছাড়া আর কোনো দরকার নেই আমার।

আহলে মিস দিপালীকে...

হাঁ, আমরাই তাকে আটক করে রেখেছি এবং তাকে আমরা বাধ্য করাবো আমাদের কাজে সহায়তা করার জন্য। যদি মঙ্গল চান, তবে দিপালীর সন্ধান থেকে পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগকে সরিয়ে নিন!

দিপালীকে তাহলে তোমরাই আটক করে রেখেছো? তোমরা কারা? তবে কি সেই চোরাচালানী দল...

হাঁ, যাদের আপনারা নির্মূল করতে চান আমরা তারা, তাদেরই একজন আমি। মনে রাখবেন কোনোদিন আমাদের নির্মূল করতে পারবেন না আপনারা, কারণ আমরা সংখ্যায় সামান্য নই।

মিঃ হেলালী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তার দুচোখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে, তিনি দাঁতে অধর দংশন করে বললেন—তোমাদের সন্ধানে যারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারাও সংখ্যায় কম নয়, বুঝলে? মনে রেখো তোমাদের নিস্তার নেই।

লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো, তারপর বললো—সন্ধান পেলে তো আপনারা আমাদের কাহিল করবেন কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি।

আমাদের আড্ডাখানার সন্ধান কোনোদিন পাবে না। স্বয়ং দস্যু বনহুর পায়নি, পাবেও না কোনোদিন।

মিঃ হেলালী বলে উঠেন—তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করবো।

লোকটা দাঁতে দাঁত পিষে বলে—আমাকে গ্রেপ্তারের পূর্বেই আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। লোকটা কথাগুলো বলে পিছু হটতে লাগলো।

মিঃ হেলালী ঠিক ঐ মুহূর্তে টেবিলের ড্রয়ারে হাত রাখলেন কিন্তু শয়তান লোকটা ততক্ষণে লাফ দিয়ে নীচে গিয়ে পড়েছে।

নিচেই তার জন্য অপেক্ষা করছিলো একটি জীপ গাড়ি।

লোকটা নিচে পড়তেই প্রহরী সজাগ হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল গর্জে উঠলো। ততক্ষণে লোকটা তার জীপে উঠে বসেছে।

প্রহরীর রাইফেলের গুলী দিয়ে বিদ্ধ হলো গাড়ির কাঁচে। কাঁচটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। ততক্ষণে গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেছে।

মিঃ হেলালী রিসিভার তুলে নিলেন এবং পুলিশ অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, এইমাত্র তাঁর বাড়ি থেকে একটি কালো রঙের গাড়ি বেরিয়ে গেলো। সেই গাড়িতে দুষ্কৃতিকারী যাচ্ছে, গাড়িখানাকে যেন আটক করা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিস থেকে দুটি পুলিশ ভ্যান বেরিয়ে এলো রাজপথে এবং তীরবেগে ছুটলো মিঃ হেলালীর বাড়ির সম্মুখ রাস্তা ধরে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীর গাড়িখানা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

বনহুর পত্রিকাখানা থেকে চোখ তুলে নিয়ে ফিরে তাকালো রহমানের মুখের দিকে, তারপর বললো সে—দুষ্কৃতিকারী মিঃ হেলালীকে সাবধান করে দিয়ে গেছে যেন মিস দিপালীর সন্ধান থেকে পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগকে সরিয়ে নেওয়া হয়। হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুত শাসন....... চমৎকার কথা, দুষ্কৃতিকারীরা সৎসাহসী বটে রহমান!

বলুন সর্দার?

মিঃ হেলালীকে দুষ্কৃতিকারী সাবধান করে দিতে এসে নিজেদের গোপনতা প্রকাশ করে গেছে। বুঝতে পারলাম মিস দিপালী এখনও জীবিত আছে। রহমান, এবার দিপালীকে খুঁজে বের করতে আমার মোটেই বিলম্ব

হবে না। তুমি এই মুহূর্তে তাজকে প্রস্তুত করো, আমি শহরের আস্তানায় যাবো। আজ রাতেই মিঃ হেলালীর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন আছে।

আচ্ছা সর্দার, আমি এইক্ষণে তাজকে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিচ্ছি। সর্দার, একটি কথা আছে।

বলো?

বৌরাণীর ইচ্ছা নূরকে পড়াশোনার ব্যাপারে বিদেশ পাঠানো, কিন্তু....

বলো, থামলে কেন?

আপনি ব্যস্ত, তাই কথাটা আপনাকে বলবার সুযোগ পাইনি।

বেশ তো। রহমান, আমিও তাই চাই, এ কথা আমি নিজেও একবার ওর মাকে বলেছিলাম।

সর্দার, আপনি অচিরে একবার বৌরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

হাঁ করবো। রহমান, জাভেদকে নিয়েই আমার বেশি ভাবনা, কারণ সে যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে মনে হয় ও মানুষ হবে না। অনেক চেষ্টা করলাম ওকে লেখাপড়া শেখাবো কিন্তু সে..... না হবে না, হবে না রহমান, ও ঠিক আমার মতই নিজকে অমানুষ....

ছিঃ, এ সব তুমি বলছো হুর? নূরী এসে বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়।

রহমান মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর নূরীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দেয়, তারপর বলে—নূরী, বড় সাধ ছিলো নূর আর জাভেদ লেখাপড়া শিখে আদর্শ মানুষ হবে। ওদের দুজনকে আমি বিদেশ পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবো, কিন্তু.......

সর্দার আমি যাই?

হাঁ যাও এবং তাড়াতাড়ি তাজকে প্রস্তুত করতে বলো।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে—তুমি, অমানুষ-এ কথা উচ্চারণ করতে পারো? তুমি যদি অমানুষ হও তবে কে মানুষ? যারা নিরীহ দুঃস্থ অসহায় মানুষের মুখের আহার কেড়ে খায় তারাই মানুষ? ওগো, তুমি নিজকে কোনো সময় অমানুষ বলোনা, আমি বড় ব্যথা পাই। নূরী আঁচলে চোখের পানি মুছে বলে—তুমি যাও, মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করোগে।

নূরী বিদেশে যাবে; এ যে আমার কি আনন্দ তোমাকে ভাষায় বলতে পারবো না।

হাঁ নূরী, তাতে আমারও আনন্দ। নূরী, একটা কথা যা আমাকে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে তোলে।

বলো কি কথা?

মনিরা আজও জানে না তার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী আছে। নূরী, এ কারণে আমাকে অনেক সময় তার কাছে নানা মিথ্যা কথা বলতে হয়। কিন্তু কতদিন এমনি করে তোমার কথা তার কাছে গোপন করে যাবো?

আনমনা হয়ে যায় নূরী।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরে—কি ভাবছো বলোতো?

ভাবছি যেদিন সে জানতে পারবে তোমার আরও একজন সঙ্গিনী আছে সেদিন সে কি করবে?

হাঁ, ঐ ভাবনাটাই আমাকে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে তোলে নূরী। মনিরা কিছুতেই ভাবতে পারে না তার স্বামী...

জানি ওগো জানি, সব জানি কিন্তু তুমিও যে আমার। আমি তোমাকে কি করে তুলে দিয়েছি তার হাতে? হুর, আমি যদি প্রথম থেকে তোমাকে নাগপাশে আবদ্ধ করতাম তুমি কি পারতে মনিরা আপাকে গ্রহণ করতে? কিছুতেই না, কারণ শিশুকাল থেকে আমি তোমাকে ভালবেসেছি, আমার ভালবাসা তুমি কোনোদিন অবহেলা করতে পারতে না।

যাক ও সব কথা। নূরী, আমাকে এক্ষুণি যেতে হচ্ছে, মিঃ হেলালীর সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত দরকার।

তুমি যে বললে কুহেলি পর্বতের কোনো এক গুহায় দস্যুরাণীকে আটক করে রেখেছো?

হাঁ, তাকে আটক করে রেখেছি। যা খাবার দিয়ে এসেছি তাতে এক সপ্তাহ চলবে। যদি সে রক্তে আঁকা ম্যাপ আমাকে না দেয় তার মুক্তি নেই।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে কায়েস—সর্দার সর্দার... কে, কায়েস?

কায়েস প্রবেশ করে সেই কক্ষে, কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার, আমাদের জম্বু আস্তানা থেকে এইমাত্র ওয়্যারলেসে সংবাদ এসেছে, জম্বু নদী অতিক্রম করে একটি চোরাচালানী জাহাজ ইমুনিয়া অভিমুখে চলে যাচ্ছে।

বলো কি?

হাঁ সর্দার।

তাহলে তো ঐ জাহাজখানাই আগে আটক করতে হয়। রহমান কোথায়?

আস্তানার বাইরে।

তাকে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায় কায়েস।

বনহুর পায়চারী শুরু করে এবং আপন মনে বলে উঠে—চোরাচালানীদের জাহাজ ধরা পড়েছে..... পুলিশ মহলের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো, আমার অনুচরদের চোখে ওরা ধরা পড়েছে....

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি যে বললে মিঃ হেলালীর সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা করা বিশেষ দরকার।

হাঁ দরকার বটে, প্রিন্স দিপালীর সন্ধান ও তার উদ্ধার ব্যাপারে মিঃ হেলালীর সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ ছিলো কিন্তু তার পূর্বেই আমাকে জম্বু রওনা হতে হবে। জম্বু থেকে চোরাচালানী দল পণ্যদ্রব্য দেশের বাইরে পাচার করছে। কিছুতেই এদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জম্বুর পুলিশ মহল বহুদিন চেষ্টা করেও এই চোরাচালানী দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারে সক্ষম হয়নি। এবার আমি এদের শায়েস্তা করবো....

নূরী বলে উঠে—এটা তো আমাদের দেশের সম্পদ নয়। কেন তুমি মিছামিছি জম্বুর চোরাচালানীদের পিছু লাগছো?

একটা ভাবগম্ভীর স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে, বললো সে—নূরী, তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বললে। সমস্ত পৃথিবীটাই আমার দেশ, আমার জন্মভূমি। সব দেশের মানুষ আমার আপনজন। সব দেশেরই কল্যাণ আমার কাম্য, সব দেশের মঙ্গল আমার সাধনা।

সর্দার!

রহমান এসেছো? শোন, এই মুহূর্তে আমাকে জম্বু যেতে হবে। জম্বু নদী অতিক্রম করে যে চোরাচালানকারী জাহাজটা জম্বুর বাইরে চলে যাচ্ছে সেই জাহাজকে আটক করতে হবে।

আদেশ করুন কি করবো?

দরবারকক্ষে চলো, কথা আছে।

বনহুর এবং রহমান বেরিয়ে গেলো।

❑

ওয়্যারলেসের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

ওপাশ থেকে শব্দ ভেসে এলো... আমরা টেলিভিশন ক্যামেরায় জাহাজখানাকে লক্ষ্য রেখেছি..... জাহাজখানা জম্বু নদীর বুক বেয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছে.....এ জাহাজে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ চোরাকারবারীরা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে....

বনহুর বললো—আমি এই মুহূর্তে রওনা দিচ্ছি....যতক্ষণ না পৌছেছি জাহাজখানা যেন লক্ষ্যচ্যুত না হয়.....

ওপাশ থেকে শোনা গেলো.... আচ্ছা সর্দার, আমরা জাহাজখানার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করছি....

ওয়্যারলেস ছেড়ে দেয় বনহুর।

রহমান এবং আরও কয়েকজন অনুচর উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাদের লক্ষ্য করে বলে—তোমরা প্রস্তুত হয়ে হিন্দল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জম্বু অভিমুখে চলে যাও। তোমাদের পৌছবার পূর্বেই আমাকে জম্বু পৌছতে হবে। আমি কান্দাই পর্বতের হিংহ্য সুড়ঙ্গপথে জম্বু আস্তানায় পৌছবো.....

রহমান বলে উঠে—সর্দার, হিংহ্য সুড়ঙ্গপথ অতি দুর্গম, অতি ভয়ঙ্কর, আপনি.....

জানি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সর্দার!

তবু আমাকে ঐ পথেই যেতে হবে, কারণ যত শীঘ্র পারি আমাকে জম্বু পৌছতে হচ্ছে। চোরাকারবারীদের জাহাজ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে কোনো উপায় থাকবে না। জাহাজখানাকে আটক করতেই হবে, নাহলে তিন কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য পাচার হয়ে যাবে। এতে চোরা কারবারীরা শুধু লাভবানই হবে না, বিরাট প্রশ্রয় পাবে। আমি তা হতে দেবো না.... দাঁতে দাঁত পিষে শেষ কথাটা উচ্চারণ করে বনহুর।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচরের মুখমণ্ডলে গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তারা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর বলে উঠে—কি ভাবছো তোমরা?

সর্দার, হিংহা সুড়ঙ্গপথে না গিয়ে কথা শেষ করতে পারলো না রহমান, বনহুর ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠে—তোমাদের ভাবতে হবে না রহমান-তোমরা চলে যাও, আমি মিঃ হেলালীর সঙ্গে দেখা করেই রওনা দেবো। তাজকে নিয়েই যাবো, কাজেই চিন্তার কারণ নেই।

রহমান বেরিয়ে গেলো, তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো অন্যান্য অনুচর।

❑

চমকে চোখ তুললেন মিঃ হেলালী— কে?

দরজা খুলন।

না, দরজা খুলবো না, আগে কে তুমি বলো?

বনহুর।

দরজা খুলে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠে—আপনি?

না বলুন তুমি

ওকথা বহুবার বলেছি, আপনাকে তুমি বলতে পারবো না। আপনি এসেছেন বড় আনন্দের কথা,বড় আনন্দের কথা। বসুন!

না, বসবার সময় নেই। কয়েকটা কথা বলতে এলাম। পত্রিকায় দেখেছি—কাজেই সব জানি যে, দুষ্কৃতিকারী আপনাকে শাসিয়ে গেছে। পুনরায় সে আসবে এবং সেই প্রতীক্ষায় আপনি প্রস্তুত থাকবেন। দীপালী বেঁচে আছে এবং সে কান্দাই শহরের কোনো এক গোপন স্থানে আটক আছে।

হাঁ, সেই লোকটার কথা শুনে সেই রকমই মনে হয়। দীপালীকে কোন চোরাকারবারী দল আটক করে রেখেছে এবং তাকে দিয়ে কাজ করে নিচ্ছে বলে হত্যা করিনি। কিন্তু আশ্চর্য, দিপালীকে যে দলটা হত্যা করে নিয়ে চোরা মাল পাচার করেছিলো, তাদের সবাই তো সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছে, অথচ.....

না, তারা সবাই গ্রেপ্তার হয়নি।

সেই লোকটা ঐ রকমই বলছিলো, আমাদের নির্মূল করতে চাইলেই নির্মূল করতে পারবেন না.....

মিথ্যা কথা সে বলেনি মিঃ হেলালী। কেউ তাদের নির্মূল করতে পারবে না কোনোদিন, কারণ আমাদেরই ঘরে ঘরে আজ দুষ্কৃতিকারীর জন্ম। হয় আপনি নয় আমি নয় আমার ভাই ভাতিজা বা আত্মীয়স্বজন। প্রকৃতির কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? না ঘটেনি তেমনি রাতের পর দিন আসছে, দিনের পর রাত হচ্ছে। পূর্বে যেমন এই দেশের মাটিতে ফসল ফলতো আজও ঠিক তেমনি ফলে। কলকারখানায় যেমন দ্রব্যাদি তৈরি হতো এখনও তাই হচ্ছে অথচ কেন, কেন আজ দেশে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই? মানুষ আজ অর্ধাহারে-অনাহারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেন? কারণ আমাদেরই ঘরে ঘরে আজ দুষ্কৃতিকারী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শত শত দুষ্কৃতিকারীর জন্ম হচ্ছে। এরা কারা জানেন?

মিঃ হেলালীর দুচোখে বিস্ময়।

বনহুর বলে চলেছে—চোরাচালানী আর মুনাফাকারী মুজুতদারী এরাই দেশের-দশের সর্বনাশ করে চলেছে। দেশের মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। দেশকে আজ সর্বহারা, রিক্ত করে তুলেছে। দেশ আজ চরম এক সমস্যার সম্মুখীন....থামলো বনহুর, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললো—আমাদের দেশের মানুষই আজ এ সর্বনাশের মূল কারণ। মিঃ হেলালী, এই মুহূর্তে

সরকারের সচেতনতার নিতান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কোথায় কে কিভাবে দেশের পণ্যদ্রব্য দেশের বাইরে পাচার করছে, এদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে।

মিঃ হেলালী বললেন—দেখুন, সরকার এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলছে। দেশের দুষ্কৃতিকারী নির্মূলে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

তবু দুষ্কৃতিকারীরা ঠিকমতই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এত প্রচেষ্টা চালিয়েও দেশকে দুষ্কৃতিকারী মুক্ত করতে পারছে না কিন্তু কেন, কি কারণ এর? মিঃ হেলালী, এর জবাব আপনিও দিতে পারবেন না, কারণ দেশের যারা নেতৃস্থানীয়, যারা পথ প্রদর্শক, তাদের মধ্যেই রয়েছে দুষ্কৃতিকারীর উৎস। তাঁরা বিড়ালতপস্বী সেজে মুখে সাধুতার বুলি আওড়িয়ে দুঃস্থ, অসহায় মানুষের রক্ত শুষে স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে। জানেন এরা কারা?

বনহুর কথার শেষ অংশটা উচ্চারণ করলো মিঃ হেলালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে।

মিঃ হেলালী বললেন—জানি, জেনেও অনেক সময় না জানার ভান করতে হয়, কারণ কোনো উপায় থাকে না। যারা দুষ্কৃতিকারিগণকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে চলেছে, তাদের অনেকেই......

সরকার পক্ষের লোক, এইতো? মিঃ হেলালী, মনে রাখবেন দেশের জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তখন কাউকে ক্ষমা করবে না। তারা ঐশ্বর্যের ইমারত থেকে টেনে নামিয়ে আনবে পথের ধুলায় গলা টিপে ধরে জবাব চাইবে তাদের অপকর্মের। সেদিন বেশি দূরে নেই...যাক, যে সব কথা। আজ কেন এসেছি কেন অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম শুনুন। দুষ্কৃতিকারীদের যে ব্যক্তি আপনাকে এসে দিপালীর সন্ধান থেকে বিরত থাকতে বলে গেছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে খুঁজে বের করতে হলে দিপালীর সন্ধান আরও জোরদার করতে হবে। তাহলেই সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় এসে হাজির হবে আপনার দরজায়। মিঃ হেলালী আপনি সতর্ক এবং সাবধান থাকবেন যেন সে এসে পালাতে সক্ষম না হয়।

আচ্ছা, আমি আপনার কথামতই কাজ করবো। তাছাড়া আমরা দিপালীর সন্ধানে আরও সজাগ হয়েছি। কারণ দিপালী জীবিত আছে এবং কান্দাই শহরেরই কোনো গোপন স্থানে আছে আমরা জানতে পেরেছি।

হাঁ ঠিক বলছেন, দিপালী জীবিত আছে এবং সে কান্দাই শহরেই আছে। তাকে খুঁজে বের করতে বেশি বেগ পেতে হবে না মিঃ হেলালীর কানে মুখ নিয়ে আরও কিছু বললো বনহুর, তারপর বেরিয়ে গেলো সে নিঃশব্দে যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

মিঃ হেলালীর মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিলো। তিনি বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

❑

খুট্ করে শব্দ হতেই মনিরার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে এক ঝলক উষ্ণ রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দে উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে ওর চোখ দুটো। তবে কি সত্যি সে এসেছে? সন্ধ্যা থেকে বাতাস এলোমেলো বইছিলো বারবার জানালায় শব্দ হচ্ছিলো। তবু এবারের শব্দটা যেন ঠিক পূর্বের মত নয়।

মনিরা সজাগ হয়ে তাকালো জানালার দিকে। মন বলছে, আজও আসবে। আরও বহুদিন সে লক্ষ্য করেছে, যেদিন ও আসবে সেদিন সকাল থেকেই কেন যেন বারবার মনে হয় ওর কথা। মনিরার মনে পড়লো সেইদিনের সেই কথা ওকে ছদ্মবেশ ধরে নিয়ে গিয়েছিলো পোড়োবাড়ির সেই নির্জন স্থানে। উঃ, প্রথম কি ভয়টাই না পেয়েছিলো, তারপর যখন বুঝতে পেরেছিলো মনিরা ড্রাইভারবেশে তারই স্বামী, সত্যি কি যে আনন্দ হয়েছিলো.....

মনিরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতেই জানালা খুলে গেলো। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো বনহুর।

মনিরার চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—জানতাম আজ তুমি আসবে।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে নিবিড়ভাবে। কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাকণ্ঠে বলে—জানতে আমি আসবো?

হাঁ জানতাম, আজ সকাল থেকে আমার মন বলছে তুমি আসবে।

তোমার সঙ্গে আমার নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাই তোমার মন সব জানতে পারে। মনিরা, আমি নিজেও আজ এখানে আসবো, সে কথা জানতাম না....

বনহুরের কথা শেষ হয় না, মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ায়।

বনহুর হেসে বলে— কি হলো?

আসতে চাওনি তবে কেন এলে?

ও, এই কথা। মনিরা তুমি ভুল করছো, আমি ঠিক.... ....

জানি তুমি অনিচ্ছা সত্ত্বে এসেছো।

বিশ্বাস করো ....

না না, আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি তো পথ ভুল করে এসেছো। যাও, যাও তবে, অমন অনিচ্ছা নিয়ে আসাটা আমি পছন্দ করি না।

মনিরা, তুমি মিছামিছি অভিমান করছো। উপস্থিত আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম তাই তোমার এখানে আসতে মনস্থির করতে পারিনি। মিঃ হেলালীর সঙ্গে দেখা করে তোমার কাছে এসেছি। জানো মনিরা, কত সাবধানে আমাকে আসতে হয়েছে। একদিকে পুলিশ বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি অপরদিকে নূরকে গোপন রেখে আমাকে আসতে হয়েছে।

কেন তুমি এমন করে আস? কেন তুমি প্রকাশ্যে আসার মত সাহস পাওনা?

তা কি তোমাকে নতুন করে বলতে হবে! মনিরা, তুমি একটুতেই অভিমান করো। কত আশা নিয়ে আমি ছুটে আসি তোমার পাশে! মনিরা, তোমার হাসিভরা মুখ আমার চলার পথে পরম সম্পদ তা কি তুমি জানো না! মনিরা কথা বলো, চুপ করে থেকো না।

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে। ওর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারে না মনিরা। শিথিল হয়ে আশে ওর দেহটা। বনহুর ওকে হাতের উপর তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দেয়। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোটা আরও বাড়িয়ে দেয়।

মনিরা চোখ দুটো তুলে ধরে স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুরের বলিষ্ঠ ওষ্ঠদ্বয় ধীরে ধীরে নেমে আশে মনিরার ওষ্ঠদ্বয়ের উপর। গভীর আবেশে চোখ দুটো মুদে আসে মনিরার। বনহুর ওর কপালের চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে—মনিরা, তুমি আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনার রাণী....

অভিমানভরা কণ্ঠে বলে মনিরা—তাই যদি হতাম তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে না, আমাকে ভুলে থাকতে না এমন করে। তুমি জানো না আমার বুকে কত ব্যথা। পৃথিবীতে এমন কোনো নারী নেই, যে স্বামীকে দূরে সরিয়ে রেখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে। ওগো, তুমি কি জানো না, তুমি কি বোঝো না আমার অন্তরে কত ব্যথা।

সব বুঝি মনিরা, সব জানি। একথা আজ তো নতুন নয়—কতদিন বলেছি তোমাকে, আমারও কি সাধ হয় না তোমাকে কাছে কাছে রাখি, কিন্তু.....

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে নূর—আম্মি আম্মি.... দরজা খোল আম্মি.....

মনিরা বলে উঠলো—সর্বনাশ, নূর জেগে উঠেছে। হয়তো সে তোমার গলার আওয়াজ পেয়েছে, এখন উপায়?

আমি চলে যাচ্ছি, তুমি দরজা খুলে দাও...

না, তোমাকে যেতে দেবো না।

নূর..নূরকে কি বলবে তুমি? মনিরা, ওকে আসতে দাও....

মনিরা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে —তুমি এমনি করে চোরের মত পালিয়ে যাবে, আমি তা সইতে পারবো না।

মনিরা, যাও লক্ষ্মীটি, যাও দরজা খুলে দাও....

বাইরে তখন বারবার ডাক দিচ্ছে নূর আম্মি... আম্মি.... আম্মি... দরজা খোলো আম্মি....।

বনহুর মনিরার ললাটে একটি চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে বললো—খোদা হাফেজ তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে জানালা পথে।

মনিরা দরজা খুলে দিতেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো নূর। কক্ষমধ্যে সর্তক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—আম্মি তোমার ঘরে কারও গলার আওয়াজ পেলাম.....

কই না তো, মনিরা বিব্রত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো শব্দটা।

নূর এখন বেশ বড় হয়েছে, সে বুঝতে পারলো তার মা মিথ্যা কথা বলছে। মায়ের মুখোভাবই তাকে যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে কথাটা তার সত্য নয়।

নূর গম্ভীরকণ্ঠে বললো পুনরায়—আম্মি, আমি স্পষ্ট শুনতে পেরেছি কোনো পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ। বলো আম্মি, কে কথা বললো তোমার ঘরে?

বললাম তো কেউনা।

আমি নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে পারি না। কেউ এসেছিলো তোমার ঘরে। বলো আম্মি কে সে? তবে কি চোর? চোর এসেছিলো তোমার ঘরে? চুপ করে থেকো না, বলো আম্মি?

এমন সময় মরিয়ম বেগম এলেন সেখানে। বললেন তিনি—কি হয়েছে নূর? এত রাতে কি হয়েছে তোদের?

নূর বললো—দাদীমা, আমি আম্মির কক্ষে কোনো লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আজ নয়, আরও একদিন শুনেছিলাম কিন্তু আম্মি বলছেন কেউ না, কিছু না। দাদীমা, তুমিই আম্মিকে জিজ্ঞাসা করো সত্যি কেউ তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো কিনা?

মরিয়ম বেগম তাকালেন পুত্রবধুর মুখের দিকে।

মনিরা নত মুখখানা তুলে শাশুড়ীর মুখে তাকালো, লজ্জায় চোখ দুটো তার আবার আপনা আপনি নত হয়ে এলো।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন মনির এসেছিলো তিনি তাকালেন ওদিকের জানালার দিকে। জানালার শার্সী খোলা, তিনি সব বুঝে নিলেন। নূরকে লক্ষ্য করে বললেন মরিয়ম বেগম— তোর শোনার ভুল হয়েছে নূর।

না, ভুল হয়নি।

এত রাতে কে আবার আসবে তোর মায়ের ঘরে? হয়তো তুই স্বপ্ন দেখছিলি।

দাদীমা, তুমিও এমনি ধরনের কথা বলবে? আমি স্বপ্ন দেখিনি, আমি জেগেছিলাম....

নূর ছোট হলে হয়তো মনিরা ওর গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিতো কিংবা এটা সেটা বলে ভোলাতে চেষ্টা করতো কিন্তু আজ নূর ছোট্টটি নেই। সে এখন বেশ বড় হয়েছে, সব বুঝতে শিখেছে।

মরিয়ম বেগম নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছেন সে যা শুনেছে সব ভুয়া এবং মিথ্যা। কিন্তু নূর কঠিন কণ্ঠে বলছে, না সে যা শুনেছে সত্য। তার মাকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। আবার নিজের মনকেও অবিশ্বাস করতে পারছে না, কারণ সে নিজ কানে শুনেছে। বলে উঠলো নূর—আমার আব্বু থাকেন না। আম্মির ঘরে পুরুষ মানুষের কণ্ঠ.... না না, এ হতে পারে না। আমার আম্মি। অসৎচরিত্র মেয়ে নন।

মনিরা ছুটে গিয়ে খাটে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে।

নূর বলে—আম্মি, আম্মি তুমিই জানো, তুমিই জানো আম্মি, সব তুমিই জানো.... নূরও ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মরিয়ম বেগম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন যেন তিনি। সব জানেন, সব বুঝতে পারছেন কিন্তু বলবার কোনো উপায় নেই।

মনিরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মরিয়ম বেগমের গলা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—মা মা মা, মামীমা, একি হলো? নিজের সন্তানের কাছে আমি আজ অপরাধিনী....

মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটাফোঁটা অশ্রু।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করে নূর, একটা অসহ্য যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে ফেলে। তার মা অসৎচরিত্র...... না, না, তা হয়না। তার মা পবিত্র। তিনি ফুলের মতই নিষ্পাপ..... কিন্তু কি করে নিজের কানকে সে অবিশ্বাস করবে। নিজের কানে সে শুনেছে মায়ের ঘরে কেউ কথা বলছে..... চাপা গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ .... তার মায়ের গলাও সে শুনতে পেয়েছে....... মা....... মা অন্য এক পুরুষের সঙ্গে .... না, না, এ হয় না, হতে পারে না। তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ...... অপরূপ তাঁর নীল দুটি চোখ। অপরূপ তাঁর হাসি........ অপরূপ তার ব্যবহার। এমন কোনো ব্যক্তি আজ তার চোখে পড়েনি যার সঙ্গে তুলনা হয় তার আব্বুর...... আম্মি সেই মহান ব্যক্তির স্ত্রী..... না না, তাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করতে পারবে না.... তবে কি

সত্যি সে নিজের কানে ভুল শুনেছে....... হয়তো খেয়াল ...... হয়তো চিন্তার বিভ্রাট....

নূর.....

কে?

অমন চমকে উঠলি কেন নূর? আমি তোর দাদীমা।

দাদীমা!

হাঁ

এত রাতে আমার ঘরে কেন এলে দাদীমা।

নূর, মাকে তুই ভুল বুঝিস্ না দাদু। তোর মা বড় হতভাগিনী।

দাদীমা, আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে একা থাকতে দাও।

নূর, তুই যা শুনেছিস্ সত্য নয়, মিথ্যা......

তাই যেন হয় দাদীমা, তাই যেন হয়।

মরিয়ম বেগম নূরের চুলে হাত বুলিয়ে দেন। নূর এখন বড় হয়েছে, তাই সে মায়ের ঘরে কিংবা দাদীর ঘরে শোয় না। এখন সে মায়ের ঘরের পাশে ছোট্ট ঘরটায় ঘুমায়। সেখানেই টেবিল চেয়ার গুছিয়ে নিয়েছে, পড়াশোনা করে।

মাঝে মাঝে দাদীর ঘরে গিয়ে তাঁর বিছানায় গড়িয়ে নেয় নূর। কখনও বা গল্প করে শুয়ে শুয়ে, কখনও দাদীর মুখে গল্প শোনে। তবে পড়াশোনার সময় সে নিজের ঘরে।

নূর পড়াশোনায় ভাল করায় তাকে সরকার কৃতী ছাত্র হিসেবে বিদেশ পাঠাচ্ছেন। বিদেশে যাওয়ার সব কিছু গোছগাছও হয়ে গেছে। এমন কি কাগজপত্র সব তৈরি। এখন সময় এলেই যাবে সে।

মনিরার বড় সাধ ছিলো ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে পড়াশোনা করাবে। সে আশা তার পূর্ণ হতে চলেছে। কত খুশি আজ মনিরা। শুধু মনিরাই নয়, চৌধুরী বাড়ির সবাই আনন্দে আপ্লুত। সরকার সাহেব থেকে বাড়ির চাকর-বাকর সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। নূর বিদেশ যাচ্ছে অনেক বড় স্বনামধন্য মানুষ হয়ে ফিরে আসবে।

নূরও প্রতীক্ষা করছে সেই দিনটির।

এমন দিনে এই ঘটনা ঘটলো। নূরের মনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলো। দাদীর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদলো সে কিছুক্ষণ।

দাদী যত বোঝান ততই নূর গম্ভীর হয়ে পড়ে। নিজকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। একটা ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়ে ছে তার মনে। মনে পড়ে আরও একদিনের কথা.....গভীর রাতে পড়াশোনা করছিলো নূর, কারণ সামনে ছিলো তার পরীক্ষা। হঠাৎ কানে এলো মায়ের ঘরে কেউ যেন কথা বলছে। নূর প্রথম সেদিকে খেয়ালই করলো না কিন্তু আবার কানে ভেসে এলো একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর। নূর সজাগভাবে শুনতে চেষ্টা করলো, তবে কি মায়ের ঘরে চোর প্রবেশ করেছে? সে দ্রুত মায়ের ঘরে প্রবেশ করেছিলো সেদিন। কাউকে দেখতে পায়নি কিন্তু একটা জিনিস তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। একটা কালো রুমাল বিছানার পাশে পড়ে ছিলো, মা অতি সাবধানে কালো রুমালখানাকে লুকিয়ে ফেলেছিলো নূর কালো রুমালখানার কথা আজও ভোলেনি.....

যেমন আলোড়ন জেগেছিলো নূরের মনে, তেমনি মনিরার বুকেও ঝড় উঠেছিলো ও বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদে, সে কান্নার যেন বিরাম নেই।

❑

জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিলো বনহুর। এ পোশাক পরলে সে সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অদ্ভুত এক পৌরুষের ছাপ পরিলক্ষিত হয় তখন তার মধ্যে। দুচোখে তখন যেন ওর আগুন ঠিকরে বের হয়, বিশেষ করে যখন সে কোনো সংগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন তাকে সিংহের চেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হয়।

বনহুর পায়চারী করছিলো। ভারী বুটের মস্‌মস্‌ শব্দের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ গুহায় অদ্ভুত এক আওয়াজ সৃষ্টি করছিলো।

নূরী এলো, চোখেমুখে তার দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ, বললো সে ব্যস্ত কণ্ঠে হুর, তুমি নাকি কান্দাই পর্বতের হিংহা সুড়ঙ্গপথে জম্বু রওনা দিচ্ছো?

হাঁ

না, তোমাকে আমি ঐ পথে যেতে দেবো না।

নূরী আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জম্বু পৌছতে হবে। হিন্দল হয়ে ওরা চলে গেছে কাল, আমাকে আজ রওনা দিয়ে ওদের পূর্বেই জম্বু পৌছতে হবে। আটক করতে হবে চোরাচালানীদের জাহাজখানা।

ওগো, আমার ভয় করছে।

নূরী, কতবার বলেছি তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। তুমি আমার বুকে সাহস যোগাবে, এটাই আমি চাই।

কিন্তু যে পথে তুমি রওনা দিচ্ছো, সে পথ যে অতি মারাত্মক, অতি ভয়ঙ্কর......

জানি।

তবু ঐ পথে যাবে তুমি?

না গিয়ে উপায় নেই।

এমন সময় ঝাম আস্তানার প্রধান অনুচর আলী হায়দার এসে উপস্থিত হয়, কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার!

আলী হায়দার তুমি এসেছো, ভালই হলো। তুমি ঝাম এবং জম্বুর সমস্ত দুঃখী জনগণকে জম্বু নদীতীরে জমায়েত হতে বলবে। পরশু আমি তাদের মধ্যে আটক জাহাজের সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিতরণ করে দেবো। যে মাল চোরাচালানীরা বিদেশে পাচার করছে সেগুলো জম্বু এবং ঝামের জনগণেরই মুখের গ্রাস, কাজেই ওগুলো তাদের মধ্যেই বণ্টন করে দিতে চাই।

আলী হায়দার বললো—আপনি ঠিকই বলেছেন সর্দার। ঝাম এবং জম্বুর অবস্থাও এখন কান্দাইয়ের মত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। দুষ্কৃতি কারীরা ভীষণভাবে তাদের প্রসার জাঁকিয়ে বসেছে। বিশেষ করে চোরাচালানী, মুনাফাকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে চরমে। সরকার প্রচেষ্টা চালিয়েও এদের কিছু করতে পারছে না, কারণ..... কথা শেষ না করেই থেমে যায়।

কারণ আমি জানি আলী হায়দার। দেশের নেতৃস্থানীয় যারা তাদেরই মধ্যে আত্মগোপন করে আছে দুষ্কৃতিকারীরা। তাদেরই অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে দেশ ও দেশের জনগণের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। সাধুতার মুখোশ পরে তারা আজ সভায়-সমিতিতে ন্যায়ের বুলি আওড়ায়—দেশ

গড়তে হবে, দেশের জনগণের মুখে আহার তুলে দিতে হবে। শয়তানের দলেরা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলছে। জানো হায়দার এক একজনের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত টাকা... আমি জানি এরা এক একজন কত টাকার মালিক। যাক ওসব কথা, আমি এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি, তুমি আমার কথামত পরশু ঝাম এবং জম্বুর নিঃসহায় মানুষদের নিয়ে জম্বু নদীতীরে অপেক্ষা করবে। মনে রেখো অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে....

সে জন্য কোনো চিন্তা করবেন না সর্দার।

আচ্ছা তবে তুমি চলে যাও।

সর্দার, আপনি হিংহা সুড়ঙ্গপথ ধরে রওনা দেবেন, কারণ.....

সে কথা আর বলতে হবে না আলী হায়দার তুমি এসো।

আচ্ছা সর্দার।

কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায় আলী হায়দার।

নূরী অবাক হয়ে শুনছিলো, এবার সে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠে—তুমি ঐ দুর্গম পথেই রওনা দেবে তাহলে? এ ছাড়া দ্রুত জম্বু পৌঁছানোর কোনো পথ নেই। নূরী, তুমি জাভেদের প্রতি লক্ষ্য রেখো, সে সব সময় গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

আজকাল ও একা নয়, বনের জীবজন্তুগুলোও ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। যেন ওরা ওর সাথী।

বনহুর একটা শব্দ করলো—হুঁ! তারপর বললো—খোদা হাফেজ! বেরিয়ে গেলো সে দ্রুত পদক্ষেপে।

নূরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর আস্তানার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই দুজন বলিষ্ঠ অনুচর তাজের লাগাম ধরে নিয়ে এলো। ওরা তাজকে দুপাশ থেকে দুজন ধরে থাকে। এ ছাড়া তাজের সঙ্গে কেউ ওরা পারে না। অদ্ভুত শক্তিশালী অশ্ব তাজ, তা সবাই জানে, তাই ওরা তাজের বেলায় সাবধান।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই তাজ সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো।

বনহুর বিলম্ব না করে চেপে বসলো তাজের পিঠে। তাজ প্রভুকে পিছে পেয়ে সম্মুখের দুটি পা তুলে চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠলো।

বনহুর তাজের পিঠে ছুটলো সেই কান্দাই পর্বত অভিমুখে। উল্কা বেগে এগুতে লাগলো তাজ। পাথুরিয়া মাটিতে প্রতিধ্বনি জাগলো তাজের খুরের।

নূরী দুহাতে কান চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময় জাভেদ এসে দাঁড়ালো—আম্মু, কি হয়েছে? তুমি অমন করে কি ভাবছো বলোতো?

কিছু না ওরে, কিছু না......

জানি, আব্বু চলে গেলো বলে তুমি ভাবছো। কিছু ভেবো না, আব্বু ঠিক কাজ সেরে চলে আসবে। আব্বুর সঙ্গে কেউ কোনোদিন লড়াইয়ে জিতবে না।

এত কথা বলতে হবে না জাভেদ, চলে যা এখানে থেকে।

আম্মু, আমাকে চলে যেতে বলছো? আব্বুর মত আমিও যদি যুদ্ধ করতে যাই, তুমি ভাববে না আমার জন্য?

নূরী ওকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। ওর কপালে একটি চুম্বনরেখা এঁকে দেয় সে।

ততক্ষণে বনহুর কান্দাই জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে পৌঁছে গেছে। তীরবেগে ছুটছে তাজ বনহুর লাগাম চেপে ধরে বসে আছে। যখন নিকটবর্তী স্থানে গমন করে তখন সে লাগাম ব্যবহার করে না। যখন দূরদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন লাগাম পরিয়ে নেয় তাজের মুখে।

একসময় পৌঁছে যায় বনহুর হিংহা সুড়ঙ্গের মুখে। কান্দাই পর্বতমালার গা বেয়ে নেমে এসেছে এক খরস্রোত জলপ্রপাত। সেই জলপ্রপাতটি ভীষণ আকারে প্রবেশ করেছে হিংহা সুড়ঙ্গমধ্যে। সুড়ঙ্গের একপাশে গভীর ঢালু, অপর পাশে খাড়া সরুপথের মত কিছু সমতল জায়গা।

বনহুর সুড়ঙ্গমুখে অশ্বের লাগাম চেপে ধরে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো। জলপ্রপাতটি ভয়ঙ্কর শব্দ করে সুড়ঙ্গমধ্যে আছড়ে পড়ছে এবং ভীষণ তর্জন গর্জন করে হুহু শব্দে এগিয়ে গেছে ভিতরের দিকে। সুড়ঙ্গপথটি বড় দুর্গম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তাজসহ সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো যতটুকু সম্ভব দ্রুত এগিয়ে চললো। যে কোনো মুহূর্তে তাজের পা পিছল গভীর জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। দুর্জয় সাহস নিয়ে এগুচ্ছে বনহুর তাজ প্রভুকে নিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে পা তুলে তুলে এগুচ্ছে। সে বুঝতে পেরেছে, বিশেষ প্রয়োজন নাহলে এ পথে প্রভু আসতো না। সুড়ঙ্গের মধ্যে স্থানে স্থানে ছাতের উপরে বড় বড় ফাটল আছে, ঐসব ফাটলের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করছে।

কাজেই সবকিছু নজরে পড়ছিলো বনহুরের নিচে গভীর জলপ্রপাত প্রবল বেগে আছাড় খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলেছে। পাশের সরু ঢালু পথ ধরে তাজের পিঠে বনহুর এগুচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে

তাকে যতেই হবে, মরলে চলবে না।

মনে মনে খোদাকে স্মরণ করে বলে বনহুর—যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেছি তুমি সফল করে।

প্রায় সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে জল স্রোতের শব্দ ভেদ করে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে ভেসে এলো। বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে বসেই সজাগ হয়ে কান পাতলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই অশ্ব বল্গা টেনে ধরলো সে। দেখতে পেলো সুড়ঙ্গপথের উপরিভাগে একটি ফাটল, ঐ ফাটলের মধ্য দিয়ে বিরাট একটি অজগর সাপ মাথা ঝুলিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। সাপের চোখ দুটো যেন এক একটি অগ্নিগোলক। বনহুর ভয় না পেলেও হকচকিয়ে গেলো। সাপ নয় যেন একটা ঝুলন্ত গাছের গুঁড়ি।

গাছের গুঁড়িটা যেন দুলছে।

বনহুর এগুলে তার কোনো উপায় নেই। সমস্ত পথ জুড়ে দুলছে সাপটা। কিন্তু তাকে যেতে হবে, ফিরে যাবার লোক সে নয় জীবনে বনহুর বহু অসাধ্য সাধন করেছে, কোনোদিন সে কোনো কাজে পিছপা হয়নি।

তাজও কেমন যেন ভড়কে গেছে।

এতবড় অজগর সাপ, ভড়কাবার কথাই বটে।

বনহুর বিলম্ব করতেও পারে না।

তাকে তাড়াতাড়ি জম্বু পৌঁছতেই হবে। ঠিক সময় পৌঁছতে না পারলে ব্যর্থ হয়ে তার যাওয়াটা। শয়তান চোরাচালানী দল তাদের চোরাই মালসহ

জাহাজখানা পার করে নেবে জম্বুর সীমান্তরেখা। আলী হায়দার জম্বু, এবং ঝামের দুঃস্থ জনগণকে নির্দিষ্ট জায়গায় আসার জন্য বলে দিয়েছে। তারা এসে ফিরে যাবে—না না, তা হয়না, তাকে যেতেই হবে কিন্তু সাপটা যে ভীষণ আকার ধারণ করে ঝুলছে তাতে এক পা অগ্রসর হবার যো নেই। বনহুর কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে নিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুঁড়লো সাপটার মাথা লক্ষ্য করে একটি নয়, পর পর কয়েকটা গুলী ছুঁড়লো বনহুর।

সাপটা ভীষণ একটা শব্দ করে ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লো জল প্রপাতের মধ্যে।

সাপটা জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ায় একরাশ ঠাণ্ডা জল ছিটকে চড়িয়ে পড়লো তাজ এবং বনহুরের শরীরে সমস্ত দেহ ভিজে চুপষে গেলো।

সাপটা জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করতে লাগলো। সেকি ভীষণ আলোড়ন! সূর্যের আলো স্পষ্টভাবে প্রবেশ না করলেও ফাটলটার মধ্য দিয়ে যে আলোকরশ্মি সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করছিলো তাতেই স্পষ্ট নজরে পড়লো, জলপ্রপাতের প্রচণ্ড স্রোতের টানে সাপটা গড়িয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে।

কিন্তু সাপটার জীবনলীলা তখনও সাঙ্গ হয়নি, তাই জলপ্রপাতে সঙ্গে বোঝাপড়া করছে সে উল্টোদিকে আসবার জন্য, গুলী খেয়ে ভীষণভাবে আহত হয়েছে সে। রাগ ওর হত্যাকারীর উপর, প্রতিশোধ নেবার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে কিন্তু কোনো উপায় নেই।

তাজ পথ মুক্ত পেয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে পিছল ঢালু পথ তাজের খুব কষ্ট হতে লাগলো। তবু সে অতি কষ্টে এগিয়ে যাচ্ছে প্রভুকে নিয়ে যেমন করে হোক গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হবে।

উদ্দেশ্য যার মহৎ খোদা তার সহায়।

বনহুর হিংস্র সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে একসময় বেরিয়ে এলো পর্বতের বাইরে। স্বচ্ছ আলোতে চোখ ঝলসে উঠলো। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা। আধো অন্ধকার দুর্গম সুড়ঙ্গমধ্যে চোখ কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছিলো। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো বনহুর এবং তাজ।

তাজ সুড়ঙ্গের বাইরে এসে যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। এবার সে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। কতকটা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন এগিয়ে চললো সে।

জম্বু আস্তানায় পৌঁছেই বনহুর সর্দার সাধন সিংকে বলে দিলো এই মুহূর্তে জাহাজ দ্রুতীকে প্রস্তুত করো। বনহুর নিজে গিয়ে দাঁড়ালো সার্চ ক্যামেরার সম্মুখে।

অদ্ভুত এ ক্যামেরা।

কয়েক হাজার মাইলের মধ্যে যা কিছু আছে ক্যামেরায় ধরা পড়বে, সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাবে।

বনহুর ক্যামেরা চালু করে দিতেই স্পষ্ট ভেসে উঠে জম্বু নদী। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্যামেরা ঘুরালো বনহুর, নদীতীর ধরে কতকগুলো ছোটবড় পাহাড়িয়া টিলা পর্দায় ভেসে উঠলো আরও অনেক কিছু নজরে পড়ছে। সার্চ ক্যামেরার সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা চালাচ্ছে বনহুর নিজে। যে পোশাকে বনহুর কান্দাই আস্তানা থেকে রওনা দিয়েছিলো এখনও তার শরীরে সেই পোশাক রয়েছে।

বনহুরের আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে জম্বু আস্তানার বিশ্বস্ত অনুচরগণ। সাধন সিং এখনও দাঁড়িয়ে আছে সর্দারের শেষ নির্দেশের আশায়।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিলো সার্চ ক্যামেরার ছোট্ট পর্দাটায়। হঠাৎ ভেসে উঠে পর্দায় তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত জাহাজখানা। বনহুর আপনা আপনি একটা শব্দ করে উঠে, আনন্দসূচক শব্দ। পর্দায় সে জাহাজখানা তাদের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে, ঐ জাহাজখানাই চোরাচালানীদের হিপ্পি নামক জাহাজ।

ঐ জাহাজে কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জাহাজখানার গোপনতা ধরা পড়ে গেছে জম্বু আস্তানার অনুচরদের মাঝে। তাই তারা জানিয়েছে তাদের সর্দার বনহুরকে।

বনহুর বলে উঠলো—জম্বু, নদীর মোহনায় আমাদের জাহাজ দ্রুতী অপেক্ষা করছে। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও, এই মুহূর্তে রওনা হতে হবে আমাদের।

বনহুর অল্পক্ষণেই দলবল সহ জাহাজ দ্রুতীর নিকটে পৌঁছে গেলো তারা সবাই অশ্বযোগে জাহাজের নিকট পৌঁছে অশ্বগুলো পুনরায় আস্তানায় ফেরত পাঠিয়ে দিলো।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র হাতে জাহাজের ইঞ্জিনরুমে গিয়ে দাঁড়ালো বনহুর। সারেঙ্গকে সে নির্দেশ দিতে লাগলো জাহাজ কোন্ পথে কিভাবে ঐ জাহাজখানাকে ফলো করবে।

সার্চ ক্যামেরাখানাও বনহুর সঙ্গে নিতে ভুলেনি, কারণ চোরাকারবারীদের জাহাজ হিপ্পি যাতে তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে না পারে, এজন্য টেলিভিশন সার্চ ক্যামেরা কাজ করছে। জাহাজখানা তখনও তাদের সার্চ ক্যামেরায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জম্বু নদীর বুক চিরে তীরবেগে ছুটছে জাহাজখানা। বনহুরের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জাহাজ, নাম ওর দ্রুতী। কারণ দ্রুতীর গতি ছিলো অত্যন্ত দ্রুত ঘন্টায় দুশত মাইল বেগে চলতো সে।

মালবোঝাই হিপ্পি যতই দ্রুত পালাতে চেষ্টা করুক দ্রুতীর কবল থেকে পালানো তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্রুতীর চালক সেভাবে জাহাজ চালনা করছে।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে পথের নির্দেশ দিচ্ছে, কখনও বা সার্চ ক্যামেরায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যান্য অনুচর সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। সর্দারের আদেশমত তারা কাজ করে চলেছে। যার যেখানে যেভাবে দরকার সেভাবেই অপেক্ষা করছে।

এতক্ষণ টেলিভিশন ক্যামেরায় জাহাজখানা নজরে আসছিলো, এখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন, চোখ দুটোতে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দৃঢ় কণ্ঠে সে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

প্রথম দিন কেটে গেলো।

দ্বিতীয় দিনে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জাহাজখানা দেখা গেলো না। তৃতীয় দিনে জাহাজখানা প্রায় কয়েক শ মাইলের মধ্যে এসে গেছে।

রাতেও ফলো করে চলেছে দ্রুতী।

তিন দিন দু'রাত কেটে গেলো। ঘুম নেই বনহুরের চোখে, ঘুম নেই তার অনুচরদের চোখে। সবাই সজাগ রয়েছে, জাহাজখানা যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায়।

আবার সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বনহুর নিজ হাতে আজ এই মুহূর্তে জাহাজ চালনা করছে। কারণ তাকে অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে হিপ্পির সম্মুখভাগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, যেন হিপ্পি একটুও অগ্রসর হতে না পারে।

জাহাজ হিপ্পির চালক বুঝতে পেরেছে তাদের জাহাজখানাকে কোনো একটি জাহাজ ফলো করছে। ওরা তাই জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণভাবে।

বনহুর নিজে চালনা করছে জাহাজখানা, এক মুহূর্তেও সে ইঞ্জিনকক্ষ থেকে বাইরে বের হয়নি। এক হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপর হাতে ইঞ্জিনের হ্যাণ্ডেল ধরে আছে সে।

রামসিং তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছে। একবার বললো রামসিং—সর্দার, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করুন। বহুক্ষণ ইঞ্জিনের পাশে আছেন, বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার.....

রামসিং, তুমি একথা বলছো? আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। জীবন দিয়েও আমি ঐ চোরাচালানী শয়তানদের শায়েস্তা করবো। রামসিং, তুমি জম্বু ঘাটিতে জানিয়ে দাও, রহমান যদি দলবল নিয়ে পৌঁছে থাকে তবে তারা যেন কয়েকখানা স্পীড বোট নিয়ে দ্রুত জম্বু নদী ধরে এগিয়ে আসে।

আচ্ছা সর্দার।

বেরিয়ে যায় রামসিং।

ওয়্যারলেস ক্যাবিনে প্রবেশ করে জম্বু আস্তানার সংবাদ নিয়ে জানতে পারে, রহমান দলবল সহ পৌঁছে গেছে, তারা জম্বু নদীপথে জাহাজ দ্রুতীর সাহায্যে রওয়ানা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রামসিং জানিয়ে দিলো সর্দারের আদেশ। রহমান পাল্টা জবাবে জানালো, তারা সর্দারের নির্দেশমতই কাজ করবে।

একসঙ্গে অনেকগুলো স্পীড বোট নিয়ে রহমান দলবলসহ জম্বু নদীপথে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রত্যেকের হাতে রইলো অগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলী বারুদ। রহমান যে স্পীড বোট নিয়ে রওনা দিলো তাতেই রইলো দিকদর্শন যন্ত্র, ওয়্যারলেস এবং আরও কিছু যন্ত্রপাতি।

মাঝে মাঝেই রহমান পথের নির্দেশের জন্য জাহাজ দ্রুতীর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিচ্ছে।

একসঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক স্পীড বোট ছুটে চলেছে। প্রত্যেকটি বোটে পাঁচজন করে লোক রয়েছে। স্পীড বোটগুলো জম্বু নদীর বুক চিরে তীরবেগে ছুটে চলেছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

গভীর নীল জলতরঙ্গ ভেদ করে স্পীড বোটগুলো যখন এগুচ্ছিলো তখন সে দৃশ্য উপভোগ করার মত ছিলো কিন্তু দৃশ্য উপভোগ করার মত কারও মনের অবস্থা ছিলো না।

বনহুর সন্ধ্যার পূর্বেই জাহাজ হিপ্পির পথ রোধ করে জাহাজখানাকে আটক করে ফেললো। অল্পক্ষণের মধ্যে বনহুর ওয়্যারলেসে শুনতে পেলো রহমান দলবল নিয়ে স্পীড বোটে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

রহমান বনহুরের কাছে নির্দেশ চাইলো এখন তাদের কি করণীয়।

বনহুর জানালো—তোমরা জাহাজখানাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলো।

রহমান তাদের স্পীড বোট নিয়ে জাহাজ হিপ্পিকে ঘেরাও করে ফেললো।

চোরাচালানকারী হিপ্পির মাঝিমাল্লা এবং পণ্যদ্রবের বাহকগণ বুঝতে পারলো তাদের জাহাজখানা এই মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রখ্যাত চোরাচালানী আব্বাস হাজারী ঐ জাহাজেই ছিলো। সে মনে করেছিলো প্রতিবার যেমন সবার চোখে ধুলো দিয়ে অতি সহজেই জম্বু নদী সীমান্ত পার হয়ে তাদের মাল বোঝাই জাহাজ বাইরে চলে আসে এবারও আসবে কিন্তু হঠাৎ একি কাণ্ড!

আব্বাস হাজারী তার বিশাল বপু নিয়ে হিপ্পির গোপন এক ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে টাকার অঙ্ক হিসেব করছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে তার একজন সহকারী জানালো তাদের জাহাজখানাকে কোনো একটি জাহাজ ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা শুনেই আব্বাস হাজারীর মুখ শুকিয়ে গেলো। কারণ তাদের জাহাজ অন্যান্য সাধারণ জাহাজ নয়, এটা চোরাচালানী মালবাহী জাহাজ এবং এ জাহাজে রয়েছে কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য।

আব্বাস হাজারী ঢোক গিলে বললো—কে তোমাকে বললো এ কথা?

মালিক ঐ দেখুন, বাইরে এসে দেখুন....

আব্বাস হাজারী মুখ চুন করে বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। ভয়ার্ত চোখে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সত্যি তাদের জাহাজ-খানাকে ফলো করে একটি ছোট্ট জাহাজ তীর বেগে ছুটে আসছে। তখন আব্বাস হাজারীর কণ্ঠনালী শুকিয়ে গিয়েছিলো। মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলো নিজের ভাগ্যের পরিণতি স্মরণ করে।

ক্যাবিনের কোণায় বসে ঈশ্বরকে জপছিলো মনে মনে। এবার বাঁচিয়ে নাও এর পরের বার এ পথে নয়, অন্য পথে কাজ চালাবো। দেখবো কার সাধ্য আমাদের চোরাই মালে হস্তক্ষেপ করে।

কিন্তু ঈশ্বর তখন হয়তো ঘুমে অচেতন, তাই আব্বাসের এত অনুনয় বিনয় সব ব্যর্থ হয়ে যায়। থেমে যায় তার হিপ্পি।

জাহাজ আটক করবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর নিজে উঠে আসে হিপ্পির উপরে।

বনহুরের দেহে জমকালো পোশাক। মাথায় তার পরিচিত পাগড়ি, পাগড়ির কিছু অংশ দিয়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা। হাতে জমকালো শব্দবিহীন মারণাস্ত্র।

বনহুরের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরগণও উঠে এলো হিপ্পির বুকে। ঘিরে ফেললো সমস্ত জাহাজখানা। বনহুর নিজে ইঞ্জিনকক্ষে গিয়ে চালকের বুকে

মারণাস্ত্র চেপে ধরলো—খবরদার একচুল নড়বে না, জাহাজের মুখ ফিরিয়ে নাও এবার।

ততক্ষণে রহমানও দলবল নিয়ে স্পীড বোটসহ ঘিরে ফেলেছে জাহাজখানা।

হিপ্পিকে আটক করে ফিরিয়ে আনলো বনহুর তার জম্বু আস্তানায়। জম্বু নদীর মোহনায় নির্জন স্থান। কতকগুলো ছোটবড় উঁচু পাথর পাহাড়ের মত স্তূপাকার হয়ে আছে, তারই একটি বড় স্তূপের আড়ালে জাহাজ হিপ্পিকে আটকে ফেলা হলো। বনহুর এবার নিজে জাহাজখানার সন্ধান চালালো।

জাহাজের খোলের মধ্যে মূল্যবান চোরাই পণ্যদ্রব্যগুলো দেখে বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো। বনহুরের অনুচরগণও শিউরে উঠলো তার মুখোভাব লক্ষ্য করে। রহমান এবং সাধন সিং সব সময় রয়েছে তার পাশে।

সাধন সিং জম্বু এবং ঝামের দুঃস্থ অসহায় মানুষগুলোকে এনে জমায়েত করেছে জম্বু নদীতীরে। হাজার হাজার মানুষ যারা অনাহারে অর্ধাহারে তিল তিল করে ধুঁকে মরছে তাদেরকেই এনেছে সাধন সিং। রহমান সাধন সিংয়ের উপর এই দায়িত্বভার অপর্ণ করেছিলো।

অগণিত জনগণ বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে এবার হয়তো তারা কিছু খেতে পাবে, পরতে পারবে।

বনহুর হিপ্পির খোলের মধ্য থেকে সমস্ত মাল নীচে নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো এবং হিপ্পির মাঝিমাল্লা আর খালাসীদের বন্দী করে ফেললো। কিন্তু মালিক কোথায়, যাদের নির্দেশমত হিপ্পি মাল বহন করে চলেছিলো ইম্বুনিয়া অভিমুখে। বনহুর যখন সঙ্গীদের নিয়ে হিপ্পির প্রতিটি ক্যাবিনে তল্লাশি চালিয়ে চলেছিলো, ঐ সময় হিপ্পির গোপন এক ক্যাবিনে আক্কাস হাজারী ও তার কয়েজন সঙ্গী টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে বসে থরথরিয়ে কাঁপছিলো।

আক্কাস হাজারীর অবস্থা ভেজা শিয়ালের মত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে করুণ, মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ। এত করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলো তবু ঘুম ভাঙ্গলো না তার। শেষ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার মাল গেলো,

তার সঙ্গে যেতে বসেছে অমূল্য সম্পদ প্রাণ। ঈশ্বরের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে এতকরে ডাকার পরও তিনি নাকে তেল দিয়ে কি করে ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু সব ব্যর্থ হলো।

আক্কাস হাজারীর বুক টিপ টিপ করছে। কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছে তার হৃৎপিণ্ডের উপরে।

হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে চোখে পড়লো একজোড়া ভারী বুট। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মেঝেতে এসে দাঁড়ালো কেউ। তার পিছনে আরও কয়েক জোড়া পা। শিউরে উঠলো আক্কাস হাজারী ও তার দলবল, কারণ তারা মনে করেছিলো হয়তো পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে— কিছু মালপানি ছাড়লেই রেহাই পেয়ে যাবে কিন্তু এরা পুলিশের লোক নয়, এবার তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো। চোখ ছানাবড়া করে প্রতীক্ষা করছে আক্কাস হাজারী আবার কি ঘটে তাদের ভাগ্যে।।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করে তাকালো ক্যাবিনের দেয়ালে কতকগুলো মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ দেয়ালের ক্যারিয়ারে ঝুলছে। শুধু তাই নয়, টেবিলের এ্যাসট্রেতে গোঁজা রয়েছে অর্ধদগ্ধ সিগারেটের অংশ। বনহুর বুঝতে পারলো এই ক্যাবিনেই আত্মগোপন করে আছে চোরাচালানকারীদের মালিক।

বনহুর অনুচরদের নির্দেশ দিলো—টেবিলে চেয়ারগুলো ক্যাবিনের বাইরে বের করে ফেলো।

অবশ্য ঐ ক্যাবিনের টেবিল-চেয়ারগুলো জাহাজের সঙ্গে সংযুক্ত করা ছিলো না বলেই কথাটা বললো বনহুর।

বনহুরের নির্দেশ পাওয়ামাত্র রহমান এবং সাধন সিং অন্যান্যদের সঙ্গে টেবিল-চেয়ার সরানোর কাজে লেগে পড়লো।

কিন্তু একটি টেবিল সরাতেই আক্কাস হাজারি ও তার সহকারীরা বেরিয়ে এলো টেবিল-চেয়ারের তলা থেকে।

এক একজন জীবন্ত শয়তানের প্রতীক।

বনহুর আব্বাস হাজারী ও তার দলবলের মুখ থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিলো নিপুণভাবে, তারপর দাঁত পিষে বললো—বড্ড ঘাবড়ে গেছেন বসুন ঐ চেয়ারগুলোতে।

ওরা কিন্তু বনহুরের গলার আওয়াজ এবং বলার ভঙ্গিতেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। বসাতো দূরের কথা, দাঁড়াতেও সাহস হচ্ছে না তাদের। শুধু কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য হারানোর ভয় নয়, ভয় প্রাণের।

বনহুর হাতের রিভলভারখানা ঘোরাতে ঘোরাতে বললো বলুন কতদিন থেকে এ ব্যবসা শুরু করেছেন?

আব্বাস হাজারী একবার সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলো, তারপর বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলো।

এখন বনহুরের মুখে কোনো আবরণ ছিলো না। আব্বাস হাজারী শুধু ভয়ই পেলো না, হতবাক হয়ে গেছে যেন— কে এই মহাপুরুষ, কি এর পরিচয়, কে জানে!

কি ভাবছেন? কি জবাব দেবেন এই তো? দেখুন, কোনো চালাকি, কোন বুদ্ধিই এখানে চলবে না, কারণ আমরা সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী নই। এতদিন মালপানি ছেড়ে অনায়াসে কাজ হাসিল করে গেছেন, আজ তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বলুন কতদিন হলো আপনারা এই ব্যবসা শুরু করেছেন এবং কোথায় কোথায় আপনাদের ঘাটি আছে। বলুন, জবাব দিন?

আব্বাস হাজারী জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে ঢোক্ গিলে বললো—আপনারা কারা বলুন তো জনাব?

যে প্রশ্ন করলাম তার জবাব দিন আগে?

জবাব দিচ্ছি কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন তো?

সঠিক জবাব দিলে ঠিক বিশ্বাস করবো।

আব্বাস হাজারী ভয় কম্পিত কণ্ঠে বললো—মাত্র এক বছর....

খবরদার, মিথ্যাকথা বলবেন না। ঠিক ঠিক আমার প্রশ্নের জবাব দিবেন, নচেৎ

দু বছর ...... না না..... তিন বছর হলো.....

মিথ্যা কথা।

দাঁড়ান বলছি.....

বলো? মুহূর্ত বিলম্ব করলে এই দেখছো, এর একটি গুলী তোমাকে হজম করতে হবে। বলো, যে প্রশ্ন করেছি তার সঠিক জবাব দাও?

বনহুর এবার আব্বাস হাজারীকে তুমি বলেই সম্বোধন করে বললো।

আব্বাস হাজারীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কারণ বনহুরের হাতের অস্ত্রখানা তাকে যে কোন মুহূর্তে শেষ করে ফেলতে পারে। আব্বাস হাজারী বারবার সঙ্গীদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিচ্ছে। জীবনে সে এমন অবস্থায় পড়েনি। তবে পুলিশের লোক কয়েকবার তাদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু যখন তারা জানতে পেরেছে এর সঙ্গে জড়িত আছেন দেশের শক্তিশালী ব্যক্তিরা, তখন মুখ বন্ধ করে পিছিয়ে গেছে তারা।

আব্বাস হাজারীর তাই চরম সাহস ছিলো কেউ কোনোদিন তাদের কাজে বাধা দিতে পারবে না। তারা নির্বিঘ্নে সমাজের মেরুদণ্ড সেজে মুখে সাধুতার বুলি আওড়িয়ে দেশের জনগণের রক্ত চুষে নিয়ে বিদেশে পাচার করে চলেছে। হঠাৎ আজ তাদের জন্য একি বিপদ নেমে এলো! আব্বাস হাজারী এবার না বলে পারলো না, সে বলে গেলো, কোথায় রয়েছে তাদের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র, কোথায় আছে কত মাল, কোথায় আছে তাদের মজুত পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি....

মৃত্যুভয়ে আব্বাস হাজারী সব কথা বলে গেলো আর সঙ্গীদের অবস্থাও ত্রাহি ত্রাহি। সবাই ফ্যাকাশে মুখে দ. .স দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

বনহুর শুনে যাচ্ছে আব্বাস হাজারীর কথাগুলো, মাঝে মাঝে হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটি ঘোরাচ্ছিলো। অবশ্য সেটা বনহুরের অভ্যাস।

আব্বাস হাজারীর কথা শেষ হলে বললো বনহুর---এর একবর্ণ যদি মিথ্যা হয় তবে তার জন্য রইলো তোমার দেহের চামড়া জীবন্ত অবস্থায়

খুলে নেওয়া, নচেৎ আমি সহজেই তোমাকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

বনহুরের বথা শুনে চোখ দুটো আরক্ত করুণ হয়ে উঠলো আক্কাস হাজারীর। সে বুঝতে পারলো মৃত্যুর হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই, তবে সহজে মৃত্যু এবং কঠিন মৃত্যু এ দুটি পার্থক্য রয়েছে।

বনহুর হেসে বললো---কি ভাবছো? দেখো, এ মুহূর্তে তোমাদের আমি কিছু বলবো না। এবার চলো জাহাজ থেকে নামতে হবে, কারণ তোমাদের মালপত্র নামানো হয়ে গেছে।

বনহুর বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর আক্কাস হাজারী ও তার সঙ্গীদের নিয়ে চললো নীচে। জম্বু নদীতীরে এসে দাঁড়ালো সবাই।

আক্কাস হাজারীও তার সঙ্গীরা তাকিয়ে দেখলো, নদীতীরে পাথর স্তূপের পাশে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে তাদের কোটি কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যগুলো। এ সময় তাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয় ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও বুঝি মানুষের অবস্থা এমন হয় না।

পাথর স্তূপের পাশে স্তূপাকার দ্রবাদি থরে থরে গুছিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে, অপর পাশে হিপ্পির মাঝিমাল্লাদের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এক পাশে অসংখ্য জনতা উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে তারা কিছু পেতে চায়।

এখন বনহুর নিজের মুখের নিচের অংশ তার পাগড়ির আঁচলে ঢেকে ফেলেছে। তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারই বিশ্বস্ত অনুচরগণ। অপেক্ষা করছে সর্দারের নির্দেশের।

বনহুর এবার বললো---রহমান, যাদের মাল তাদের দ্বারা বিতরণ করাই আমি শ্রেয় মনে করি। কাজেই এদের প্রত্যেকের হাত এবং পায়ের শিকল মুক্ত করে দাও।

বনহুরের আদেশ পাওয়ামাত্র মুক্ত করে দেওয়া হলো আক্কাস হাজারীর ও তার সঙ্গীদের বন্ধন।

মাঝিমাল্লাদেরও হাত এবং পায়ের বন্ধন মুক্ত করা হলো।

বনহুর রহমান এবং সাধন সিংকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা মাঝি এবং খালাসীদের দ্বারা পণ্যদ্রব্যগুলোর বাণ্ডিল খুলে নাও। আর তোমরা দ্রব্যগুলো তুলে দাও দ্রব্যেগুলোর মালিকদের হাতে। তাঁরা সেগুলো বিতরণ করে দিক এইসব অসহায় দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

রহমান এবং সাধন সিং ও বনহুরের অন্যান্য অনুচর কাজ শুরু করে দিলো। তারা হিপ্পির চালক থেকে খালাসি পর্যন্ত সবাইকে পণ্যদ্রব্যের বাণ্ডিলগুলো খুলে গুছিয়ে রাখতে বললো।

সবাই কাজ করে চলেছে।

হাতুড়ি শাবল দিয়ে বাণ্ডিলগুলো খুলছে। কয়েকজন সেগুলো আগলা করে সাজিয়ে রাখছে। কয়েকজন ঢেলে দিচ্ছে আব্বাস হাজারী ও তার সঙ্গীদের হাতে।

ওরা যেন স্থবিরের মত চুপ হয়ে গেছে।

বনহুর ইংগিত করতেই এগিয়ে এলো দুঃস্থ অসহায় জনগণ।

আব্বাস হাজারী ও তার সঙ্গীদের হুকুম করলো বনহুর—মালগুলো এদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তোমরা এ জন্য দানের সওয়াব লাভ করবে।

আব্বাস হাজারী ও তার সঙ্গীদের মুখ চুন হয়ে গেছে। ওরা যন্ত্রচালিতের মত দ্রব্যগুলো এক এক করে ঢেলে দিচ্ছে দুঃস্থ জনগণের হাতে।

অদ্ভুত এ দৃশ্য!

জম্বুর আকাশ বাতাস, পাহাড় নদী যেন পুলকিত হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্য যেন শুধু অপূর্ব অদ্ভুত মোহময় নয়, এক বিস্ময়কর অভিনব ভাবের উন্মেষ।

বিতরণ শেষ করে বনহুর ফিরে এলো তার জম্বু আস্তানায়। বিশ্রাম গুহায় প্রবেশ করে খুলে ফেললো তার মাথার পাগড়ি এবং কোমরের বেল্টখানা। দেহটা এলিয়ে দিলো সে শয্যায়। পাশে টেবিলে স্তূপাকার ফলমূল রেকাবিতে সাজানো।

বনহুর সবেমাত্র শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেটে আগুন ধরালো, ঠিক ঐ মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো রহমান— সর্দার!

কি সংবাদ রহমান?

সর্দার প্রথমেই বলেছিলাম আক্কাস হাজারী ও তাদের সঙ্গীদের মুক্তি না দেওয়াই শ্রেয় ছিলো।

কি সংবাদ তাই বলো। বনহুর শয্যায় উঠে বসলো।

রহমানের পেছনে সাধন সিংও সেই গুহায় প্রবেশ করেছে।

রহমান বলবার পূর্বেই বলে উঠলো সাধন সিং—জম্বুর পুলিশ বাহিনী সমস্ত বস্তি এলাকা ঘেরাও করে দুঃস্থ জনগণকে মারপিট করছে এবং তাদের দলের লোকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। ক্ষিপ্রভাবে নেমে দাঁড়ালো শয্যায় নিচে। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো—নিশ্চয়ই আক্কাস হাজারী পুলিশের কাছে সব জানিয়েছে।

হাঁ সর্দার। বলে রহমান।

সাধন সিং বললো—কুকুরের লেজ কোনোদিন সোজা হয় না। সর্দার, আপনি ক্ষমা করেছিলেন তার অনুনয় বিনয় শুনে, কিন্তু....

আমি জানতাম সাধন সিং, আমি জানতাম তবু কেন ওদের মুক্তি দিয়েছি জানো? নিজ হাতে নিজেদের পাপের সঞ্চিত সঞ্চয় দান করেও যদি সুমতি হয়। তা ছাড়া আমার আরও একটি উদ্দেশ্য, আক্কাস হাজারীর পিছনে জম্বু, এবং ঝাম শহরের যে সব শক্তিশালী ব্যক্তি আছে তাদের খুঁজে বের করা এবং ওদের দ্বারাই আমি তা করবো। থামলো বনহুর, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলো—সেইসব শক্তিশালী ব্যক্তি কারা যারা আক্কাস হাজারীর এই দুর্ভোগের জন্য মুষড়ে পড়ে পুলিশ মহলের সাহায্য নিচ্ছে? একটা স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে— কাজ আমার অনেক সহজ হয়ে এসেছে রহমান, সাধন সিং, কাজ অনেক সহজ হয়ে এসেছে.....কথাটা বলে বনহুর রেকাবি থেকে ফল তুলে নিয়ে চিবুতে শুরু করলো।

রহমান এবং সাধন সিং মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তারা বুঝতে পেরেছে কেন অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের মুক্তি দিয়েছিলো সর্দার, কেন তাদের সেই মুহূর্তে হত্যা করেনি। সর্দারের আচরণের সত্যে তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। সর্দারের মনে ছিলো নতুন এক আবিষ্কারের উপলব্ধি, এটা সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারেনি তারা।

দ্রব্যগুলো দান করা শেষ হলে বনহুর নিজে আক্কাস হাজারীকে শহরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলো। তার সঙ্গের সবাইকে মুক্তি দিয়েছিলো। বিনাদ্বিধায়। মাঝি এবং খালাসিদের মধ্যে প্রচুর পণ্যদ্রব্য দিয়েছিলো যেন ওরা আর কোনো অপকর্ম না করে। কারণ দুঃস্থ শ্রমিক মজুর যারা, তারা পেটের দায়ে পড়েই অপকর্ম করে থাকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে বাঁচানোর জন্য তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, কাজেই বনহুর এই ধরনের অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেয়।

কিন্তু ক্ষমা করে না সে যাদের প্রচুর আছে অথচ অপকর্ম করে তাদের। তারা যেই হোকনা কেন।

বনহুর বললো—তোমরা যাও, প্রয়োজন মুহূর্তে ডাকবো।

রহমান এবং সাধন সিং কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

❑

জম্বু পুলিশ বাহিনীর ক্যাম্পের নির্ভৃত প্রাঙ্গণ। বস্তি এলাকায় সমস্ত দুঃস্থ জনসাধারণকে প্রাঙ্গনে জমায়েত করা হয়েছে। প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে হান্টার দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে আক্কাস হাজারী এবং পুলিশ প্রধান। আক্কাস হাজারী নিজে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কারা ছিলো সেই জম্বু নদীতীরে যখন সে নিজ হস্তে পণ্যদ্রব্যগুলো বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

আক্কাস হাজারী যাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের পায়ের হাঁটুতে হান্টার চালাচ্ছে পুলিশগণ। নির্মমভাবে আঘাতে করছে আর জিজ্ঞাসাবাদ করছে— বল্ যে বেটা তোদের মধ্যে এসব মূল্যবান জিনিসপত্র বিলিয়ে দিলো কে সে?কি তার নাম?

ওরা আঘাত সহ্য করতে না পেরে তীব্র আর্তনাদ করে উঠছে আর বলছে—বিশ্বাস করুন আমরা তাকে চিনি না; আমরা তাকে চিনি না।

পুলিশ প্রধান অবশ্য চুপ রয়েছেন, কারণ তিনি জানেন দুঃস্থ জনগণের প্রাপ্য জিনিসগুলোই তাদের মধ্যে কোন মহান ব্যক্তি বিলিয়ে দিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু তিনি এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাচ্ছেন, কারণ টেলিফোনে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দুঃস্থ নামধারী বস্তির বাসিন্দা দৃষ্কৃতিকারীদের শায়েস্তা না করলে আসল দৃষ্কৃতিকারীকে পাকড়াও করা যাবে না। মনে মনে ইচ্ছা না থাকলেও অনিচ্ছা প্রকাশ করার মত সাধ্য পুলিশ প্রধানের ছিলো না। কারণ যে ব্যক্তিগণ ফোনে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন দেশের মহামান্য শক্তিশালী ব্যক্তি, দেশের নেতা তাঁরা।

পুলিশ প্রধানের সাধ্য নেই তাঁদের কথা অমান্য করেন। কাজেই অন্তরে নিরুৎসাহ পোষণ করলেও পরম উৎসাহ দেখিয়েই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। পুলিশ ফোর্স নিয়ে নিজে গিয়ে বস্তি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এনেছেন দুঃস্থ জনগণকে।

আক্কাস হাজারী পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত, রয়েছে, কাজেই মনে তার অসীম সাহস। প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষে পিষে কথা বলছিলো। কে সেই লোকটা যাকে সে নিজেও চিনতে পারেনি। যে তাদের মালগুলো গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলো।

আক্কাস হাজারী নিজের হাতে হান্টার তুলে নিলে এবং প্রত্যেককে নির্মম ভাবে প্রহার করে চললো। আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে চললো—বল্ কে সেই শয়তান যে তোদের মধ্যে আমাদের কোটি কোটি টাকার মাল বিলিয়ে দিলো? বল্ না বললে সবাইকে মেরে হাড্ডি গুঁড়িয়ে দেবো? তারপর জেল

হবে... ফাঁস দেবো তোদের সবাইকে। কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য সব তোরা আত্মসাৎ করেছিস্ চোর বদমাইশের দল.... শুধু চোর নস্ তোরা ডাকু, তোরা ডাকাত.... সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের হান্টারের আঘাত এসে পড়ে নিরীহ মানুষগুলোর শরীরে।

তীব্র আর্তনাদ করে কেঁদে উঠে ওরা।

এইভাবে চলে ওদের উপর নির্মম অত্যাচার। কিন্তু কোনো উত্তর ওরা দিতে পারে না, কারণ ওরাও জানে না কে সে যে তাদের মুখের খাবার তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে, পরনে কাপড় যুগিয়েছে, বাঁচার এতটুকু ভরসা এসেছে তাদের কিন্তু কেউ জানে না তার পরিচয়। নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও ওরা কোনো সঠিক জবাব দিতে পারছে না পুলিশ বাহিনীর প্রশ্নের আবার ফোন এলো পুলিশ অফিসে, একটিকেও যেন মুক্তি দেওয়া না হয়। সবাইকে জম্বু জেলে আটক করে রাখার নির্দেশ এলো উপর থেকে আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন পুলিশ প্রধান, কারণ তাঁরা এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির হাতের পুতুল। এদের যেভাবে তারা চালিত করছে তারা সেইভাবে চালিত হচ্ছে।

পুলিশ মহলের কোনো ক্ষমতা নেই তারা স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে।

বস্তির দুঃস্থ মানুষদের জম্বু, জেলে বন্দী করে ফেলা হলো, কারণ তারা তাদের আটককৃত জাহাজের মূল্যবান পণ্যদ্রব্যগুলো গ্রহণ করেছে। এ অপরাধ পুলিশমহল ক্ষমা করতে পারে না, কারণ তারা দেশের শক্তিশালী ব্যক্তিদের নাচের পুতুল।

সর্দার, দুঃস্থ জনগণকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে এক একজনকে অফিসারগণ জেলে থেকে বের করে এনে জিজ্ঞাসা বাদ এবং নির্মম প্রহার করছে। ওদের দেহের চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে। বেচারীরা তবু বলতে পারছে না কিছু, উত্তর দিতে পারছে না কারণ তারা....

রহমানের মুখের কথা শেষ না হতেই বলে উঠে বনহুর—তারা জানে না কে সেই ব্যক্তি যার পরিচয় ওরা তাদের কাছে জানতে চায়, এইতো?

হাঁ সর্দার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—বড় আফসোস, নিরীহ মানুষগুলো সব সময় এভাবেই নির্যাতিত হয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে। যেদিকে তাকাও দেখবে, দেশের দুঃস্থ জনগণ সর্বতোভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। সমাজে তাদের কোনো দাম নেই। কিন্তু আর নয়, এই অন্যায় অনাচারের বাঁধন ভেঙ্গে নতুন সমাজ তৈরি করতে হবে। যে সমাজে ধনী দরিদ্রের সমাজে অধিকার থাকবে। রহমান।

বলুন সর্দার?

এদের সবাইকে জেল থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমি কান্দাই ফিরে যেতে পারছি না। এদের এই নির্মম অবস্থার জন্য দায়ী আমি, কাজেই আমাকে একটা সুরাহা করতে হবে। একটি বিশেষ কাজ রয়েছে, সে হলো দস্যুরাণীকে কুহেলী পর্বতে আটক করে রেখেছি, তাকে কিছু খেতে দিয়ে আসা আমি যে ফলমূল দিয়ে এসেছিলাম হয়তো শেষ হয়ে এসেছে....

সর্দার, আদেশ করুন কি করতে হবে?

তুমি এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, আমি তাজকে নিয়ে কুহেলী পর্বতে যাচ্ছি, ফিরে এসে নাচের পুতুলগুলোকে নাচাতে হবে.....